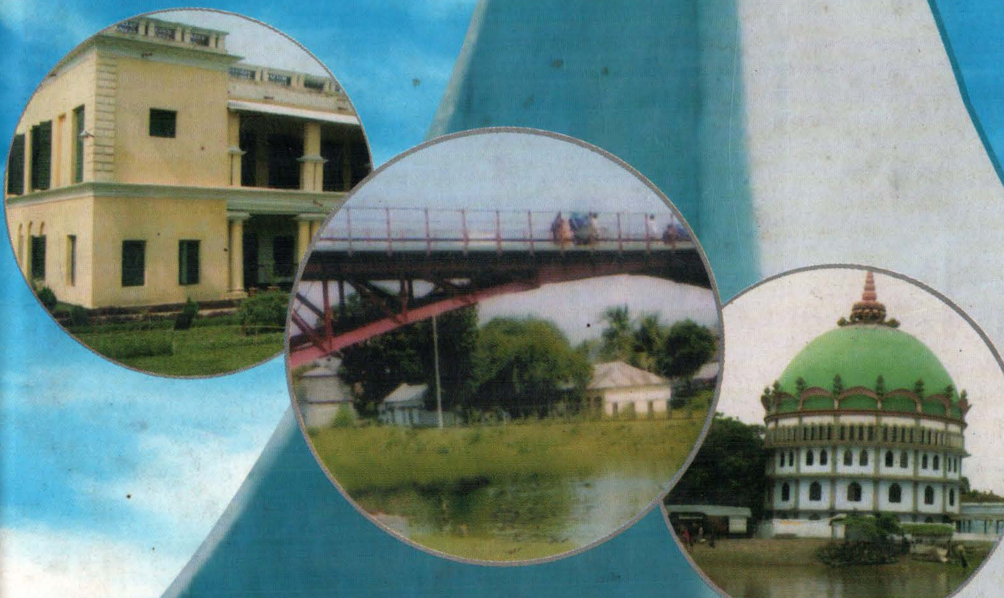
মুক্তিযুদ্ধে সিরাজগঞ্জ

মোঃ লুৎফর রহমান দুদু





আমাদের স্বাধীন বাংলার ৬৪ জেলার একটি জেলা সিরাজগঞ্জ। জেলাটি যমুনা নদীর তীরে দাঁড়িয়ে আছে। সিরাজগঞ্জ জেলার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস– বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ লুৎফর রহমান দুদু ও অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধাদের সহায়তায় রচিত হয়েছে 'মুক্তিযুদ্ধে সিরাজগঞ্জ' গ্রন্থটি।

ইতিহাস অতীতকে জীবন্ত করে রাখে বর্তমানকে জানিয়ে দেবার জন্যই। নতুন প্রজন্ম সিরাজগঞ্জের মুক্তিযুদ্ধের অতীত ইতিহাসকে খুঁজে পাবে এই গ্রন্থে আমার বিশ্বাস।

—সম্পাদক



মোঃ লুৎফর রহমান দুদু । পিতাঃ মরহুম ওসমান গণি সরকার । মাতাঃ মরহুম আয়েশা খাতুন । ১ অক্টোবর ১৯৫০ সালে সিরাজগঞ্জ জেলার কাজিপুর থানার অন্তর্গত দোয়েল গ্রামে তার জন্ম ।
শিক্ষা : দোয়েল প্রাথমিক বিদ্যালয়, তারাকান্দি স্কুল, হরিণাবাগবাটি স্কুল । এইচএসসি জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, বিএসসি সিরাজগঞ্জ মহাবিদ্যালয় । ১৯৬৯ এ পূর্ব পাকিস্তান সংগ্রাম পরিষদে অংশগ্রহণ করেন । ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধে ভারতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হয়ে ৭নং সেক্টরের অধীনে কাজীপুরের মুক্তিবাহিনীর কমান্ডার নিযুক্ত হন ।
তিনি কাজীপুরের বাংলাবাজার বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, মুক্তিযোদ্ধা কারিগর হাইস্কুল, মুক্তিযোদ্ধা কারিগরী কলেজ ও বাংলাবাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন ।
স্ত্রী : ডাক্তার মাজেদা খাতুন ।
তিন কন্যা : ডাক্তার তানিয়া সুলতানা, ডাক্তার নাদিয়া সুলতানা ও প্রকৌশলী ফারিয়া সুলতানা ।

মুক্তিযুদ্ধে সিরাজগঞ্জ

মোঃ লুৎফর রহমান দুদু

উপদেষ্টা সম্পাদক

আলী নিয়ামত

সম্পাদক

জুবায়ের হোসেন লিটন

ছায়াবীথি

প্রথম প্রকাশ
অগ্রহায়ণ ১৪১৮
ডিসেম্বর ২০১২

প্রকাশক
মো. জাহাঙ্গীর আলম সুজন
ছায়াবীথি
৪৫/১-এ পুরানা পল্টন, ৪র্থ তলা, ঢাকা ১০০০
মোবাইল : ০১৭২৩৮০৭৫৩৯
E-mail sujancomputer@gmail.com

প্রচ্ছদ
সুজন জাহাঙ্গীর

কম্পিউটার কম্পোজ
অ্যালিয়েন গ্রাফিক্স
৪৫/১-এ, পুরানা পল্টন, ৪র্থ তলা, ঢাকা ১০০০

মুদ্রণ
প্রগতি প্রেস
ফরাগগঞ্জ, ঢাকা ১০০০

মূল্য : ১৫০.০০ টাকা

MUKTIZUDDE SIRAJGONG Written by Md. Lutfar Rahman Dudu Edited by Jubayar Hossain Liton Published Md. Jahangir Alam, Chyabithi, 45/1-A Purana Paltan, 3rd Floor, Dhaka 1000

Price : Tk. 150.00 only. US $ 7.00

ISBN : 978-984-90273-7-9

উৎসর্গ

সিরাজগঞ্জ জেলার
যত বীর-মুক্তযোদ্ধা

বাঙালির হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ অর্জন স্বাধীনতা। হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ গৌরব স্বাধীনতা। আর স্বাধীনতায় তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা এবং অবিস্মরণীয় অবদান রেখেছেন আমাদের বীর-মুক্তিযোদ্ধারা। জাতীয় জীবনের এক শ্রেষ্ঠ অর্জন হলো বাঙালির স্বাধীনতা। এই স্বাধীনতা এসেছে তিরিশ লক্ষ জীবনের রক্তস্রোতের বিনিময়ে। আর এই স্বাধীনতা ও মুক্তির পথ দেখিয়েছেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

আমাদের স্বাধীন বাংলার ৬৪ জেলার একটি জেলা সিরাজগঞ্জ। জেলাটি যমুনা নদীর তীরে দাঁড়িয়ে আছে। সিরাজগঞ্জ জেলার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ লুৎফর রহমান দুদু অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোগিতায় সাধ্যমতো লিপিবদ্ধ করার চেষ্টা করেছেন 'মুক্তিযুদ্ধে সিরাজগঞ্জ' গ্রন্থে।

ইতিহাস অতীতকে জীবন্ত করে রাখে বর্তমানকে জানিয়ে দেবার জন্যেই। আমার বিশ্বাস নতুন প্রজন্ম সিরাজগঞ্জের মুক্তিযুদ্ধের অতীত ইতিহাসকে খুঁজে পাবে এই গ্রন্থে।

এই গ্রন্থটির কাজ করতে গিয়ে সিরাজগঞ্জের বীর-মুক্তিযোদ্ধাদের অবদান, আত্মাহুতি এবং দেশপ্রেমের বিষয়ে জানতে ও বুঝতে পেরেছি।

অতীতকে স্বীকার করে যথাযথ মর্যাদা দেবার দায়িত্ব-বোধেরই ক্ষুদ্র বহিঃপ্রকাশ 'মুক্তিযুদ্ধে সিরাজগঞ্জ' স্মারক গ্রন্থ।

'মুক্তিযুদ্ধে সিরাজগঞ্জ' গ্রন্থটি সব শ্রেণীর পাঠককে অনুপ্রাণিত করলেই মনে করব এ প্রকাশনার উদ্দেশ্য সফল হয়েছে।

জুবায়ের হোসেন লিটন
সম্পাদক

কৃতজ্ঞতা স্বীকার
নুরুল হুদা
সাকাওয়াত হোসেন
হামিদুর রহমান
আবাহন কালচারাল ক্লাব



জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান



ক্যাপ্টেন এম. মনসুর আলী

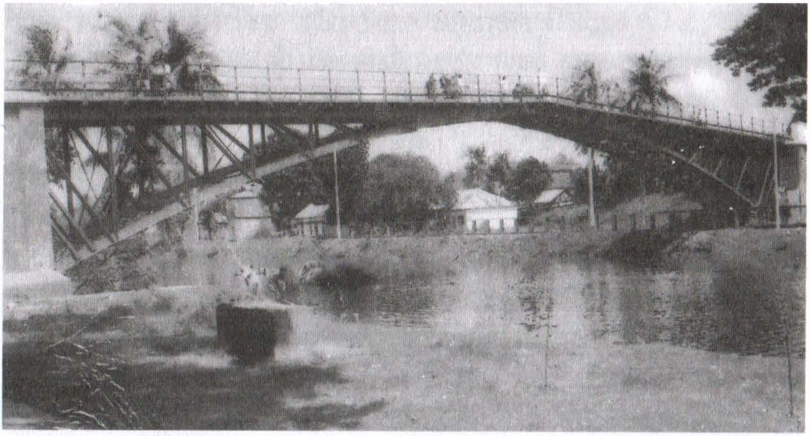
উত্তরবঙ্গের প্রবেশদ্বার, নানান ঐতিহাসিক নিদর্শনসমৃদ্ধ বংলাদেশের একটি জেলা সিরাজগঞ্জ।

সিরাজগঞ্জের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস লিখতে গেলে ইতিহাস থেকে সংগৃহীত কিছু তথ্য তুলে ধরা অতি জরুরী। বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে সংগ্রহ করা কিছু পরিচয় এখানে তুলে ধরছি। ১৯৭১ সালের কথা এতকাল পরে লিখতে গেলে কিছু না কিছু ভুল-ভ্রান্তি হওয়াটাই স্বাভাবিক। আমি অনাকাঙ্ক্ষিত ভুলের জন্য অগ্রিম ক্ষমাপ্রার্থী। আশা করি, পাঠকেরা নিজগুণে মার্জনা করবেন।

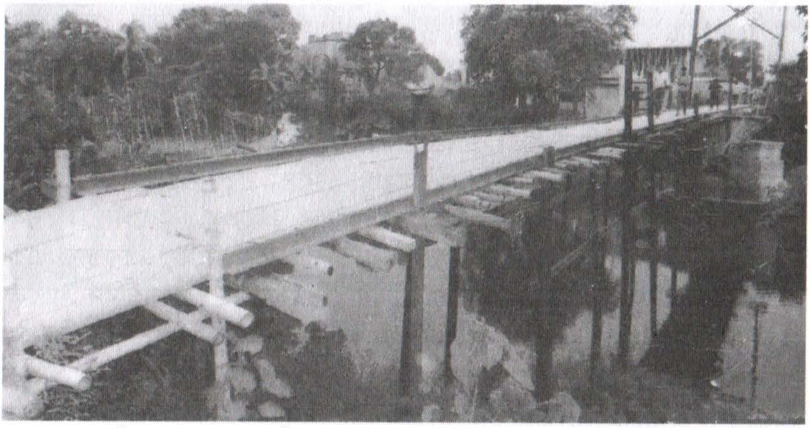
ইতিহাস থেকে জানা যায়, মোঘল বাদশা জাহাঙ্গীরের সময় বাংলাকে প্রশাসনিক সুবিধার্থে কয়েকটি সরকারে ভাগ করা হয়। সেই সরকারগুলির মধ্যে সর্ববৃহৎ আয়তনবিশিষ্ট সরকারের নাম ছিল 'বড় বাজুহা'। পরবর্তীতে এই বড় বাজুহা সরকারকে ৩২টি মহল বা পরগণায় ভাগ করা হয়। যার একটির নাম "বড় বাজু"। যতদূর জানা যায়, বর্তমানের সিরাজগঞ্জ জেলাটি সেই "বড় বাজুর" অন্তর্গত একটি অঞ্চল। ১৬০৮ সালে মোঘল সুবেদার ইসলাম খাঁ, ঈসা খাঁর পুত্র মুসা খাঁ-কে পরাজিত করে বাংলার রাজধানী সোনারগাঁওসহ চট্টগ্রাম ও ত্রিপুরা দখল করে নেয়। এই ইসলাম খাঁর কাছ থেকে জনৈক আফজাল মাহমুদ "বড় বাজু" পরগণাটির পত্তনি গ্রহণ করেন এবং বেলকুচিতে সদর দপ্তর স্থাপন করে জমিদারী পরিচালনা করেন। পরবর্তী সময়ে বৃটিশ সরকারের গভর্নর লর্ড কর্নওয়ালিশের রাজত্বকালে জনৈক সিরাজ আলী চৌধুরী বড় বাজুর সাত আনার অংশ তার নিজ নাম 'সিরাজ' অনুযায়ী "সিরাজগঞ্জ জমিদারী" নামে পত্তনি গ্রহণ করেন। সেই থেকে সিরাজগঞ্জ নামের উৎপত্তি হয়েছে। সিরাজগঞ্জের আদি নাম ছিল 'গঞ্জ'। বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় বিশেষ করে নদীর তীরবর্তী যেসব স্থানে হাটবাজার বা ব্যবসা কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল, ঐসব স্থানকে 'গঞ্জ' বলা হত। পরবর্তীতে মুসলিম শাসন আমলে জমিদার বা ইজারাদারদের নাম অনুযায়ী ঐসব স্থানের নামকরণ করা হয়। যেমনঃ কিশোরগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, দয়াগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, সেতাবগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, গোপালগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ ইত্যাদি।

জমিদার সিরাজ আলী চৌধুরী সোহাগপুরে সদরদপ্তর স্থাপন করে সিরাজগঞ্জের জমিদারী পরিচালনা করেন। সিরাজগঞ্জ এলাকাটি ১৭৮৭ সালে বৃহত্তর মোমেনশাহী জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৭৯০ সালে প্রশাসনিক কাজের সুবিধার জন্য বিশাল মোমেনশাহী জেলার বিভিন্ন স্থানে ছোট ছোট থানা স্থাপন

করা হয়। তখন থেকে সিরাজগঞ্জ থানা হিসেবে কার্যকারিতা পায়। সিরাজগঞ্জ যমুনা নদীর পশ্চিম পাড়ে থাকার দরুন বিভিন্ন কাজের জন্য বিশাল যমুনা পাড়ি দিয়ে মোমেনশাহী সদর দপ্তরে ঐ এলাকার মানুষকে যাতায়াত করতে হত, যা ছিল কঠিন ব্যাপার। কারণ আজকের এ যমুনা তখনও ৫ মাইলের বেশি প্রশস্ত ছিল। নৌকা ছাড়া পারাপারের অন্য কোন ব্যবস্থা ছিল না। সিরাজগঞ্জ এলাকার মানুষ তখন দাবী করে সিরাজগঞ্জকে মোমেনশাহী থেকে কেটে নিয়ে পাবনা জেলার অন্তর্ভুক্ত করার জন্য। ১৮৪৫ সালে জনগণের দাবীর প্রেক্ষিতে ইংরেজ সরকার মোমেনশাহী জেলার জামালপুর ও সিরাজগঞ্জকে মহকুমায় উন্নীত করে সিরাজগঞ্জকে মোমেনশাহী থেকে বাদ দিয়ে পাবনা জেলার অন্তর্ভুক্ত করে। ১৮৭৫ সালে রায়গঞ্জ থানাকে সিরাজগঞ্জ মহকুমার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ইতোপূর্বেই ১৮৫৪ সালে রেলওয়ে আইন পাশ হওয়ার পর কলকাতা থেকে সিরাজগঞ্জ হয়ে চট্টগ্রাম পর্যন্ত রেলওয়ে স্থাপিত হওয়ায় সিরাজগঞ্জের গুরুত্ব বেড়ে যায় বহুগুণে। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি ঘটায় সিরাজগঞ্জ ব্যবসা কেন্দ্র হিসেবে গড়ে ওঠে। ইংরেজ বেনিয়ারা স্থাপন করে পাটের কুঠি। কুঠিয়াল ছাড়াও এখানে আসে অনেক মারওয়ারী ব্যবসায়ী। কলকাতার সাথে সরাসরি রেল যোগাযোগ থাকায় সিরাজগঞ্জে গড়ে ওঠে আধুনিক শহর হিসেবে। জমজমাট ব্যবসার এ শহরে মালামাল পরিবহনের জন্য যমুনা নদী থেকে খাল কেটে শহরের ভিতর দিয়ে ভিক্টোরিয়া হাইস্কুলের পাশ দিয়ে পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হওয়া পশ্চিমে চন্দ্রকোণায় ইছামতি নদীর সাথে মিলিত হয়েছে। অপর শাখা দক্ষিণ দিকে শহরের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে দক্ষিণে হুরাসাগর নদীর সাথে সংযোগ স্থাপন করেছে। খালটি 'কাটাখালী' নামে পরিচিত। কাটাখালীতে সারা বছরই নৌকা চলাচল করত। খালের দুই পারে অনেক ব্যবসা কেন্দ্র গড়ে ওঠে। ১৮৯৫ সালে ইংরেজ এসডিও মিঃ বিটশান বেল সাহেব কাটাখালির উপর ব্রিজ নির্মাণ করে তৎকালীন বাংলার ছোট লাট চার্লস আলফ্রেড ইলিয়টের নামানুসারে 'ইলিয়ট ব্রিজ' নামকরণ করেন। ব্রিজটি আজও ঐতিহাসিক সাক্ষ্য প্রদান করছে। এছাড়াও বাহির গোলায় কাটাখালী অপর শাখার উপর নির্মিত হয় ঘূর্ণায়মান রেলব্রিজ। এই ব্রিজটি নৌ-চলাচলের জন্য প্রতিদিন নির্ধারিত সময়ে খুলে দেওয়া হত। কালের সাক্ষী হিসাবে এই ব্রিজের ভগ্নাংশ আজও বাহির গোলায় কাটাখালির উপরে দাঁড়িয়ে আছে। এই তো সেদিনও অর্থাৎ ষাটের দশকেও এই খাল দিয়ে লঞ্চ চলাচল করত। আমি ঐ পথে লঞ্চযোগে সিরাজগঞ্জ থেকে সোনামুখী পর্যন্ত ভ্রমণ করেছি। সিরাজগঞ্জকে কেন্দ্র করে ৩টি রেলস্টেশন স্থাপিত হয়। রায়পুর, বাজার স্টেশন এবং বাহিরগোলা স্টেশন। এ ছাড়াও যমুনা



সিরাজগঞ্জের কাটাখালীর উপর নির্মিত ঐতিহ্যবাহী ইলিয়ট ব্রীজ



সিরাজগঞ্জের কাটাখালী অপর শাখার উপর নির্মিত হয় ঘূর্ণায়মান রেলব্রিজ

পারাপারের জন্য ছিল সিরাজগঞ্জ স্টিমার ঘাট। এক সময়ে উত্তরে যার অস্তিত্ব মেছরায় পাওয়া যায়। সিরাজগঞ্জ শুধু ব্যবসায়িক দিক দিয়েই সমৃদ্ধ নয়, এর আছে অনেক রাজনৈতিক পটভূমি। বাংলার স্বাধীন সুবেদার ঈশা খাঁর আমল থেকেই এ অঞ্চলের মানুষ স্বাধীনচেতা ছিল।

আজকের সিরাজগঞ্জ স্বাধীন বাংলাদেশের একটি পূর্ণাঙ্গ জেলা। স্বাধীনতার আগেই সিরাজগঞ্জ পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের একটি সাংগঠনিক জেলা ছিল। উত্তরবঙ্গের প্রবেশদ্বার বলা হত সিরাজগঞ্জকে। ১৯৭৩ সনে সিরাজগঞ্জকে জেলা হিসেবে ঘোষণা করেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর

রহমান। ১৯৭৫ সালে দুর্ভাগ্যজনক রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের কারণে সেই ঘোষণা বাস্তাবায়ন করার কোন সুযোগ তিনি পান নি। ১৯৮৪ সালে এরশাদ সরকার সিরাজগঞ্জকে জেলায় রূপদান করেন। বহুকাল আগে থেকেই সিরাজগঞ্জের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। এই সিরাজগঞ্জে জন্মেছিলেন এক কালের অগ্নিপুরুষ 'অনল-প্রবাহ' কাব্যের রচয়িতা সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী, উপমহাদেশের প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর মজলুম জননেতা বাংলার কৃষক দরদী মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী, সর্বজনশ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব, তুখোড় পার্লামেন্টারিয়ান জনাব আবদুর রশীদ তর্কবাগিশ, স্বাধীনতা যুদ্ধের অগ্রনায়ক বঙ্গবন্ধুর অতি ঘনিষ্ঠজন প্রবাসী সরকারের অর্থমন্ত্রী, স্বাধীন বাংলাদেশের যোগাযোগ, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং পরবর্তীতে প্রধানমন্ত্রী ক্যাপ্টেন এম. মনসুর আলীর মত জাতীয় নেতৃবর্গ। এই মাটিতেই জন্মেছিলেন তৎকালীন পাকিস্তান সরকারের শিল্পমন্ত্রী আবদুল্লাহ আল মাহমুদের মত রাজনীতিবিদ। এ মাটিতে জন্মে ঝরে গেছেন আরও অনেক কৃতিসন্তান, যাঁদের মধ্যে জনাব আবদুল মোমেন তালুকদার, জনাব এ্যাডভোকেট দবির উদ্দিন, জনাব মোতাহার হোসেন তালুকদার, জনাব শহিদুল ইসলাম তালুকদার, জনাব আমির হোসেন ভুলু, জনাব আব্দুল লতিফ মির্জা উল্লেখযোগ্য।

সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে সিরাজগঞ্জের আছে গর্বিত ইতিহাস। সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী, নজিবর রহমান সাহিত্য রত্ন, বন্দে আলী মিয়া, সাহিত্যিক বরকতুল্লাহ, রজনীকান্ত সেন, পণ্ডিত জি.এম. হিলালী, ইউনুস উদ্দিন মল্লিকসহ আরও অনেক বরেণ্য কবি ও সাহিত্যিকের জন্মস্থান এই সিরাজগঞ্জে। ভাষা সৈনিক আবদুল মতিন, বিশ্ববরেণ্য অঙ্কশাস্ত্রবিদ গণিত সম্রাট যাদবচন্দ্র চক্রবর্তী এবং বিজ্ঞানী ড. আব্দুল্লাহ-আল-মুতি শরফউদ্দিনের মত কৃতি-সন্তানদের বক্ষে ধারণ করে সিরাজগঞ্জ হয়েছে মহিমান্বিত। সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বের অভাব নেই সিরাজগঞ্জে। কিংবদন্তীর বাংলা ছায়াছাবির নায়িকা সুচিত্রা সেনের জন্ম সিরাজগঞ্জে রজনীকান্ত সেনের নানা বাড়িতে (সেন ডাঙাবাড়ী নানা বাড়িতে জন্ম)। বর্তমানের আধুনিক সংগীত শিল্পী বাপ্পী লাহিড়ী, হৈমন্তী শুকলা এই সিরাজগঞ্জেরই সন্তান। এছাড়াও রূপকথার নায়িকা বেহুলা সুন্দরীর জন্মস্থান তাড়াশের বিনসারা গ্রামে অধুনা আবিষ্কৃত হওয়ায় সিরাজগঞ্জের ঐতিহাসিক গুরুত্ব আরও বেড়ে গেছে অনেকগুণে।

শাহজাদপুরের কুঠিবাড়ী স্মরণ করে দেয় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের বাস্তবমুখী পদচারণার কথা। মুসলিম-স্থাপত্য-শিল্পের উপস্থিতিও নেহায়েত কম নয়। পনের শ' শতাব্দীর মুসলিম স্থাপত্য-শিল্পের নিদর্শন ধারণ করে দাঁড়িয়ে আছে নওগাঁয় হাজী গাজী শাহ সুফি জিন্দানী (রহঃ)-এর মাজার। পাথর কেটে তৈরি

করা পনের গম্বুজবিশিষ্ট হযরত শাহ্ মগদুম শাহদৌলা (রহঃ)-র মাজার ও মসজিদটি মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুরে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে সিরাজগঞ্জের স্বতন্ত্র ভূমিকার গৌরবময় ইতিহাস সৃষ্টিকারী অনেক রাজনৈতিক নেতাকে বক্ষে ধারণ করে পালন করেছে সিরাজগঞ্জ। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ সন্তানদের অনেকে শহীদ হয়ে বাংলার স্বাধীনতা যুদ্ধের এক গৌরবময় অধ্যায় সৃষ্টি করেছেন এই সিরাজগঞ্জে। স্বাধীনতা পূর্ব সময়ে সিরাজগঞ্জের কৃতি-সন্তানেরা রেখেছিল যে-রাজনৈতিক সাফল্য, ১৯৭১ সালে তারই প্রতিফলন ঘটেছিল রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে। সেই মহান মুক্তিযুদ্ধে দেশ মাতৃকার মুক্তির সংগ্রামে সামান্যতম অবদান রাখতে পেরে নিজকে ধন্য মনে করছি।



সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুরে রবীন্দ্রনাথের কুঠিবাড়ী (পুরাতন)



সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুরে রবীন্দ্রনাথের কুঠিবাড়ী (নতুন)



সিরাজগঞ্জের পনের গম্বুজবিশিষ্ট হযরত শাহ্ মগদুম শাহদৌলা (রহঃ)-এর মাজার ও মসজিদ (শাহজাদপুর)

৭ই মার্চের বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ঘোষণার পর সারাদেশের মত সিরাজগঞ্জেও আওয়ামী সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয় এমনভাবেই :

১. মোতাহার হোসেন তালুকদার, এম.এন.এ. সিরাজগঞ্জ (আহ্বায়ক), কাজীপুর
২. আনোয়ার হোসেন রতু (সদস্য সচিব)
৩. আব্দুল মোমিন তালুকদার, এম.এন.এ. (সদস্য)
৪. সৈয়দ হামদার আলী, এমপি (সদস্য)
৫. দবির উদ্দিন আহম্মদ, এমপি (সদস্য)
৬. রওশনুল হক, এমপি (সদস্য)
৭. শহিদুল ইসলাম তালুকদার (সদস্য)
৮. ডাঃ আবু হেনা এমপি (সদস্য)
৯. গোলাম হাসনায়েন (সদস্য)
১০. আমির হোসেন ভুলু (সদস্য)
১১. আমিনুল ইসলাম চৌধুরী (সদস্য)

১৯৬৬ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছয় দফা ঘোষণা করেন, যা ছিল মূলত বাঙালির স্বাধীনতার দাবি। এই দাবি উত্থাপিত হবার পর পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বাঙালির কণ্ঠ রোধ করার জন্য নানারকম ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। এক পর্যায়ে গ্রেপ্তার ক'রে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করে এবং সামরিক

আদালতে গোপনে বিচার ক'রে বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুদণ্ড দেয়ার পাঁয়তারা করতে থাকেন। এ ঘটনায় বাংলার ছাত্রসমাজ গর্জে ওঠে। ছাত্রসমাজের তীব্র আন্দোলনের সাথে মিলিত হয় বাংলার আপামর জনসাধারণ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গঠিত হয় সর্বদলীয় ছাত্রঐক্য সংগ্রাম পরিষদ। আজকের আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য জনাব তোফায়েল আহমেদ তৎকালীন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, ডাকসুর নির্বাচিত ভিপি। সর্বদলীয় ছাত্রঐক্য সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক নিযুক্ত হন। ছাত্রঐক্য সংগ্রাম পরিষদ উত্থাপন করে ঐতিহাসিক ১১ দফা দাবি। এই ১১ দফা এবং বঙ্গবন্ধুর ছয় দফা একই সূত্রে গাঁথা। বঙ্গবন্ধুকে জেল থেকে বের করার জন্য গড়ে ওঠে তীব্র আন্দোলন। সারা পূর্ব-পাকিস্তানে সেই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে দাবানলের মত। ছাত্রলীগের নেতৃত্বে সারাদেশের সকল বিশ্ববিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় ও মাধ্যমিক স্কুলসহ সকল শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান তথা সর্বত্র গড়ে ওঠে ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ। তারই ধারাবাহিকতায় ১৯৬৮ সালে তদানীন্তন সিরাজগঞ্জ মহাবিদ্যালয়ের তৎকালীন ছাত্রসংসদের জি. এস. জনাব সিরাজুল ইসলাম খানকে আহ্বায়ক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট সর্বদলীয় ছাত্রঐক্য সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। উক্ত পরিষদের অন্যান্য সদস্যদের নাম এই মুহূর্তে স্মরণে না আসায় উল্লেখ করতে পারলাম না ব'লে আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত। উক্ত সংগ্রাম পরিষদের নেতৃত্বে সিরাজগঞ্জে ১১ দফা এবং আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে ৬ দফা বাস্তবায়নের জন্য তীব্র আন্দোলন গড়ে ওঠে। ধীরে ধীরে উক্ত আন্দোলন '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানে রূপ নেয়।

'জেলের তালা ভাঙব, শেখ মুজিবকে আনব'– ইত্যাদি শ্লোগানে মুখরিত হয়ে ওঠে সমগ্র দেশ। বাংলাদেশের সাড়ে চারকোটি মানুষ তখন সারাক্ষণ উৎকণ্ঠিত থাকে তাদের নেতার জন্য। আবদুর রাজ্জাক, আবদুল কুদ্দুস মাখন প্রমুখ ছাত্রনেতাদের নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাসে। এসব ছাত্রনেতারা বঙ্গবন্ধুর নির্দেশক্রমে তাদের কর্মসূচি নিয়ে ছড়িয়ে পড়েন সারাদেশে। মহাজনসমুদ্রে স্বাধীনতার ঘোষণার এ্যাটম বোম বিস্ফোরণ ঘটান বঙ্গবন্ধু।

সাগরের ঢেউয়ের মত উত্তাল গতিতে সারাদেশময় ছড়িয়ে পড়ে স্বাধীনতার ডাক। সেই ঢেউ আছড়ে পড়ে সিরাজগঞ্জের উত্তাল যমুনায়।

ইতোপূর্বে সারাদেশের মত সিরাজগঞ্জেও গঠিত হয় আওয়ামী লীগ এবং ছাত্রলীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদ।

সিরাজগঞ্জের আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে ছিলেন সর্বজনাব মরহুম মোতাহার হোসেন তালুকদার (সভাপতি), সৈয়দ হায়দার আলী (সাধারণ সম্পাদক),

মরহুম দবির উদ্দিন আহমেদ (অ্যাডভোকেট), আবদুল মোমেন তালুকদার (অ্যাডভোকেট), শহীদুল ইসলাম তালুকদার, ডা. মতিয়ার রহমান তালুকদার, ডাঃ আবু হেনা, গোলাম হাসনায়েন, আনোয়ার হোসেন রতু এবং তৎকালীন তুখোড় ছাত্রনেতা থেকে আসা আমির হোসেন ভুলু ও আমিনুল ইসলাম চৌধুরী। এ সমস্ত নেতৃবর্গের প্রচেষ্টায় সিরাজগঞ্জে গড়ে ওঠে তুমুল আন্দোলন। ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের ক্ষমতা আরোহণের পর ক্যাপ্টেন এম. মনসুর আলী কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রী নিযুক্ত হওয়ায় বস্তুত তাঁকে কেন্দ্র করেই সিরাজগঞ্জের রাজনৈতিক ভিত্তি সুদৃঢ় হয়ে ওঠে। মনসুর আলী সাহেব সিরাজগঞ্জের অধিবাসী হলেও কাজীপুর থানাই ছিল তার রাজনৈতিক চারণভূমি। কাজীপুরের বেয়াড়া গ্রামের নূর-এ-এলাহি পরিবার থেকে শুরু করে গ্রান্ধাইলের মরহুম মোজাম্মেল হোসেন ও মরহুম পিয়ার আলী মাস্টার, বুরুঙ্গীর মরহুম ইয়াকুব আলী সরকার, মেঘাই গ্রামের মরহুম মোখলেসুর রহমান এবং ভাঙ্গারছেও গ্রামের মরহুম আজিজুর রহমান সরকারসহ আরও অনেক প্রভাবশালী গ্রাম্য ব্যক্তিবর্গ মনসুর আলী সাহেবের অন্যতম সহযোগী হয়ে ওঠেন। কাজীপুরে সৃষ্টি হয় প্রগতিশীল রাজনৈতিক ধারার সুদৃঢ় পটভূমি। অন্যদিকে সিরাজগঞ্জের মুসলিম লীগের পাতাকাবাহী আবদুল্লাহ্ আল মাহমুদ সাহেবের পাকিস্তানী পতাকার ধারক-বাহক হয়ে যারা ছিলেন, তাদের মধ্যে অন্যতম সিরাজগঞ্জের শামসুল আল-আমিন, উল্লাপাড়ার মিনহাজ উদ্দিন মির্জা, শুভগাছার ইউনুস উদ্দিন তালুকদার, সিরাজগঞ্জের গোলাম আজম মোক্তার, আলতাফ হোসেন, লেবু মিঞা, ভাটপিয়ারের আবদুর রহমান চেয়ারম্যান, গজারিয়ার আবুল হোসেন মুন্সী, কাজীপুরের আবদুল খালেক চেয়ারম্যান, সিরাজগঞ্জের স্বনামধন্য ঐতিহাসিক সাহিত্যিক বলাকান যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী গাজী ইসমাইল হোসেন সিরাজীর পুত্র আসাদুল্লাহ সিরাজী প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ। বামপন্থী রাজনীতির হাল ধরেছিলেন সর্বজনাব মরহুম সাইফুল ইসলাম, মরহুম ইসাহাক আলী মোক্তার, হেদায়েতুল ইসলামসহ আরও অনেকে। সিরাজগঞ্জের রাজনীতিতে তখন ছাত্র ইউনিয়ন মতিয়া গ্রুপের প্রকোপ খুব বেশী ছিল। ছাত্র ফেডারেশনও কম ছিল না।

শান্তি কমিটি

১. আসাদ উল্লাহ সিরাজী	সিরাজগঞ্জ	সভাপতি
২. তারিকুল ইসলাম লেবু মিয়া	সিরাজগঞ্জ	সদস্য সচিব
৩. শামসুদ্দিন ইয়াহিয়া (প্রাঃ এম.এন.এ.)	শাহজাদপুর	সদস্য

৪. গোলাম আজম মোক্তার	সিরাজগঞ্জ	সদস্য
৫. আবুল হোসেন মুন্সী	গজারিয়া, সিরাজগঞ্জ	সদস্য
৬. আবদুল খালেক চেয়ারম্যান	কাজীপুর	সদস্য
৭. ইউনুস উদ্দিন তাং (চেয়ারম্যান)	কাজীপুর	সদস্য
৮. আবদুর রহমান (চেয়ারম্যান)	সিরাজগঞ্জ	সদস্য
৯. তোজাম্মেল হক	কামারখন্দ	সদস্য
১০. জনাব আলী	তাড়াশ	সদস্য
১১. মিনহাজ মির্জা	উল্লাপাড়া	সদস্য

এরা ছাড়াও বেশ কয়েকজন। যত দূর জানা যায়, এদের মধ্যে মিনহাজ মির্জা এবং আবদুর রহমান চেয়ারম্যান ছাড়া বাকি সবাই ছিলেন তৎপর। যেমন কাজীপুরের দলিল বকস চেয়ারম্যান, আবদুল গনি মিয়া, আঃ মজিদ তাং প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ।

সে সময় সিরাজগঞ্জের শামসুল আল আমিন প্রাক্তন এম.পি. এবং সোহাগপুরের এম.এ. মতিন সাহেব ঢাকার কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটির যথাক্রমে ৮নং এবং ২৭নং সদস্য ছিলেন।

এ ছাড়াও সিরাজগঞ্জের এই কমিটির নির্দেশে গঠিত হয় রাজাকার আলবদর বাহিনী। আবদুল মজিদ, সিরাজগঞ্জ সিমলা, মনসের ডাকাত কাজীপুর, সিরাজগঞ্জসহ আরও অনেকে রাজাকার বাহিনীতে যোগ দেয়।

সিরাজগঞ্জের বিভিন্ন গ্রামে মিলিটারীদেরকে সাথে নিয়ে এরা চালিয়েছিল হত্যাযজ্ঞ ও অত্যাচার, নিপীড়ন, অগ্নিসংযোগ, লুটপাট ও নারী ধর্ষণ।

৭ই মার্চের স্বাধীনতা ঘোষণার পর ৮ই মার্চ সিরাজগঞ্জ মহকুমা ছাত্রলীগের নেতৃত্বে গঠিত হয় স্বাধীন বাংলা ছাত্রঐক্য সংগ্রাম পরিষদ। এ পরিষদে সর্বদলীয় ছাত্রনেতারা অন্তর্ভুক্ত হয়। তৎকালীন সিরাজগঞ্জ মহকুমা ছাত্রলীগের সভাপতি (১) জনাব মহিউদ্দিন আলমগীরকে আহ্বায়ক (২) জনাব আজিজুল হক বকুলকে সদস্য সচিব এবং সর্বজনাব (৩) আবদুল লতিফ মির্জা (৪) সিরাজুল ইসলাম খান, (৫) আবদুর রউফ পাতা, (৬) সোহরাব আলী সরকার, (৭) আবদুল আজিজ মির্জা (৮) ইসাহাক আলী (৯) আবদুল হামিদ তাং (১০) আমির হোসেন খান এবং (১১) জাহিদুল ইসলাম ঝন্টুকে সদস্য নিযুক্ত করে গঠিত হয় ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ।

আওয়ামী লীগের জেলা কমিটির তরুণ সদস্য তৎকালীন তুখোড় ছাত্রনেতা জনাব আমির হোসেন ভুলুকে দায়িত্ব দেয়া হয় ছাত্রসংগ্রাম পরিষদের সাথে সমন্বয় সাধন করে মুক্তিযোদ্ধা সংগ্রহ এবং প্রশিক্ষণ দেয়ার ব্যবস্থা করার।

জনাব আমির হোসেন ভুলু সেই ব্যক্তি, যিনি সিরাজগঞ্জ মহাবিদ্যালয়ে তথা সিরাজগঞ্জ মহকুমায় পূর্ব-পাকিস্তান ছাত্রলীগকে প্রতিষ্ঠা করেন। (অবশ্য এর আগে ১৯৫৮ সালে জনাব আবদুল গফুর তরফদার ও জনাব আবদুর রউফ সিরাজগঞ্জে ছাত্রলীগ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছিলেন।) সর্বজনশ্রদ্ধেয় প্রাণপুরুষ অসাধারণ সাংগঠনিক ক্ষমতার অধিকারী সংগ্রামী মানুষটির জন্ম ১৯৪০ সালে কাজীপুরের রেহাইবেতগাড়ী গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে (আদি নিবাস চর দোরতা)। পিতা মরহুম বন্দে আলী সরকার। সরিষাবাড়ীতে রেলি ব্রাদার্স পাটের কুঠিতে তিনি ছিলেন কমিশনভুক্ত দালাল। তিনি নিজেও পাটের ব্যবসা করে প্রচুর অর্থের মালিক হন। তিনি অত্যন্ত সরল মনের মাটির মানুষ ছিলেন। মাটির মতই কোমল ছিল তাঁর হৃদয়। আমির হোসেন ভুলু ছিলেন পরিবারের চতুর্থ ছেলে। বড় ছেলে আলহাজ্ব মরহুম আজিজুর রহমানের সাথে আমার মেজো ফুফুর বিয়ে হয়। সেই সুবাদে আমির হোসেন ভুলুকে খুব কাছে থেকে সেই ছোটবেলা চিনবার সৌভাগ্য আমার হয়। শৈশবে পার্শ্ববর্তী দোয়েল গ্রামে আমাদের বাড়িতে থেকেই তিনি প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। ৫ম শ্রেণী পাশ করেন দোয়েল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে। এরপর তারাকান্দি জুনিয়র হাইস্কুলে ৭ম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশুনা করেন আমাদের বাড়িতে থেকেই। আমার ছোট চাচা হবিবর রহমান ছিলেন তাঁর সহপাঠী। বেশ খারাপ ছাত্র ছিলেন। তাই শিক্ষকদের সাথে পরামর্শ করে আমার বাবা তাকে ব্যবসায় নামান। তৎকালীন পাকিস্তান হাটের উপর (বর্তমানে বিলুপ্ত বাংলাবাজার) আমাদের দোকান ছিল। আমার ফুফারও দোকান ছিল। চাচাকে বাবা দোকানে বসান। তাই দেখে আমার ফুপা আমির হোসেন ভুলুকেও দোকানে বসিয়ে দেন পড়াশুনা বন্ধ করে। আমার আজও মনে পড়ে সেদিনের কথা। বছর পার হওয়ার পর আমার বাবা আমার ফুপাকে বকাবকি করেন ভুলু কাকাকে দোকানে বসানোর জন্য। আমির হোসেন ভুলুকে একরকম জোর করেই আমার বাবা দোকান থেকে বের করেন স্কুলে ভর্তি হওয়ার জন্য। প্রতিভাবান আমির হোসেন ভুলু চলে যান সিরাজগঞ্জে। প্রথমে মেছরা হাইস্কুল, পরে ভিক্টোরিয়া হাইস্কুলে ভর্তি হন ৮ম শ্রেণীতে। সেই থেকে তাকে আর পেছনের দিকে তাকাতে হয় নি। স্কুলে পড়ার সময়েই ক্লাস ক্যাপ্টেন এবং পরে জেনারেল ক্যাপ্টেন নির্বাচিত হন। জড়িয়ে পড়েন নানারকম সমাজসেবামূলক কাজে। সিরাজগঞ্জ মহকুমা শহরের প্রতিটি অলি-গলিতে তাঁর পদচারণা ছিল। ছোট-বড়, ধনী-গরীব সকলের সাথেই ছিল তাঁর সুসম্পর্ক। মেথর পট্টি থেকে শুরু করে গাড়োয়ান সমিতি, বণিক সমিতি, শ্রমিক সমিতি, সবরকম সমিতি বা সংগঠনের সাথে জড়িয়ে পড়েন তিনি। সম্ভবতঃ ১৯৬২ সালে স্কুল পেরিয়ে

কলেজে ভর্তি হয়ে ঢাকায় গিয়ে তৎকালীন ঢাকা বিশ্বদ্যালয়ের ছাত্রনেতা মরহুম আবদুর রাজ্জাকের হাত ধরে ছাত্রলীগে যোগদান করে সিরাজগঞ্জে ছাত্রলীগ প্রতিষ্ঠা করার দায়িত্ব নিয়ে আসেন। তাঁর প্রথম সাথী হিসাবে আমিনুল ইসলাম চৌধুরী ছাত্রলীগে যোগদান করেন। আস্তে আস্তে শফিউল আলম, রফিকুল ইসলাম, বেগমাসহ আরও কয়েকজন ছাত্রলীগের সদস্যপদ গ্রহণ করেন। অসীম ব্যক্তিত্বের অধিকারী আমির হোসেন ভুলু কলেজ সংসদে ছাত্রলীগের পক্ষে নির্বাচন করে ইন্টারমিডিয়েটে পড়ার সময় ক্রীড়া সম্পাদক এবং ডিগ্রীতে পড়ার সময় ভিপি নির্বাচিত হন। এই সংগ্রামী মানুষটি অক্লান্ত পরিশ্রম করে সিরাজগঞ্জে পূর্ব-পাকিস্তান ছাত্রলীগ প্রতিষ্ঠা করেন, যা সিরাজগঞ্জ মহকুমায় আওয়ামী লীগের রাজনীতির বিস্তৃতিতে সাংঘাতিকভাবে সহায়তা করে। ১৯৬৬ সালে বি.এ. পাশ করার পর তিনি চলে যান পশ্চিম-পাকিস্তানে এবং সেখানে করাচি বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.এ.তে ভর্তি হন। বাঙালি সংস্কৃতি যার মনে, সে কি আর উর্দু ভাষীদের মাঝে থাকতে পারেন? করাচী ইউনিভার্সিটিতে ছাত্রলীগের রাজনীতি প্রসারের চেষ্টা করে মারামারি করে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্‌র মাজারে লাথি মেরে, তার কাগজপত্র ফেলে ঢাকায় চলে আসেন। ঢাকায় এসে লেখাপড়া বন্ধ করে ব্যবসা শুরু করেন। মিউনিসিপ্যালিটির প্রথম শ্রেণীর ঠিকাদারী লাইসেন্স করে ব্যবসা শুরু করেন। বাবার ব্যবসা ধরে রাখেন তিনি। আওয়ামী লীগে যোগ দিয়ে পুরোদমে রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। ছাত্রদের সাথে ছিল তাঁর নিবিড় সম্পর্ক। তৎকালীন ছাত্রনেতা আবদুল লতিফ মির্জা, সিরাজুল ইসলাম খান, আবদুল হামিদ তাং, ইসমাইল হোসেনসহ সকলের কাছেই তিনি ছিলেন রাজনৈতিক গুরু এবং সবার শ্রদ্ধেয় আমির ভাই কারো কারো কাছে ভুলু ভাই।

এই আমির হোসেন ভুলু আওয়ামী লীগ এবং ছাত্রসংগ্রাম পরিষদের সাথে সমন্বয় করে মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতির জন্য যোদ্ধা সংগ্রহ করতে থাকেন।

'কিংবদন্তীর আমির হোসেন ভুলু।'

সিরাজগঞ্জের সর্বস্তরের শ্রদ্ধাভাজন, মুক্তিযোদ্ধাদের শ্রদ্ধেয় ভুলু ভাই। ছাত্রসমাজের আমির ভাই। সিরাজগঞ্জের রাজনীতি, সামাজিক কর্মকাণ্ড এবং মুক্তিযুদ্ধের এক মহানায়ক আমির হোসেন ভুলু সাংঘাতিক প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে তার অসাধারণ সাংগঠনিক ক্ষমতা ব্যবহার ক'রে এক দুর্যোগময় মুহূর্তে পশ্চিম-পাকিস্তানী শাসকদের নির্যাতন-নিপীড়নকে উপেক্ষা করে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে বাঙালি জাতীয়তাবাদের আদর্শের ধারক ও বাহক প্রগতিশীল

ছাত্র রাজনৈতিক সংগঠন পূর্ব-পাকিস্তান ছাত্রলীগকে সফলভাবে গড়ে তুলেছিলেন। সিরাজগঞ্জে সেই ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করা ছিল সত্যিই কঠিন ব্যাপার। '৬০-এর দশকের বঙ্গবন্ধুর বাঙালির মুক্তিসনদ ৬ দফা আন্দোলন ছাত্রদের ১১ দফা এবং '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান, '৭০-এর ঐতিহাসিক অসাধারণ নির্বাচন এবং '৭১-এর সর্বশ্রেষ্ঠ অর্জন মহান মুক্তিযুদ্ধের বিরল ঘটনার মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জনের কার্যক্রমে তিনি ছিলেন এক বিরল চরিত্র। তাঁর তুলনা তিনি নিজেই। দুর্নীতি, কালো টাকার দৌরাত্ম্যে রাজনীতি যখন অন্ধকারে নিমজ্জিত, তখন আমির হোসেন ভুলুর সংগ্রামী চেতনা, নির্লোভ চরিত্র, সাদামাটা জীবন-যাপন, মানুষকে অভিভূত করেছিল। '৬০-এর দশকে তিনি ছিলেন সকল ছাত্রদের রাজনৈতিক শিক্ষাগুরু। সিরাজগঞ্জের ইতিহাসে যত গুণীজন ঐতিহাসিক পটভূমি রচনা করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে আমির হোসেন ভুলু ছিলেন এক ব্যতিক্রমী নেতা। তাঁর সাংগঠনিক দক্ষতা এবং দৃঢ়তা দিয়ে গড়েছিলেন আপন-সাম্রাজ্য। তিনি ছাত্রলীগ সভাপতি থেকে শুরু ক'রে আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক ও সাধারণ সম্পাদক, শ্রমিক লীগের সভাপতিই ছিলেন না, তিনি ছিলেন অদম্য সাহসী মুক্তিপাগল মানুষ। স্বাধীনতার চেতনায় উদ্বুদ্ধ সিরাজগঞ্জের মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক। তাঁর অসাধারণ ব্যবহার, সরলতা, অমলিন হাসি যুদ্ধের ময়দানেও সহযোদ্ধাদের মনে উৎসাহ যোগাত।

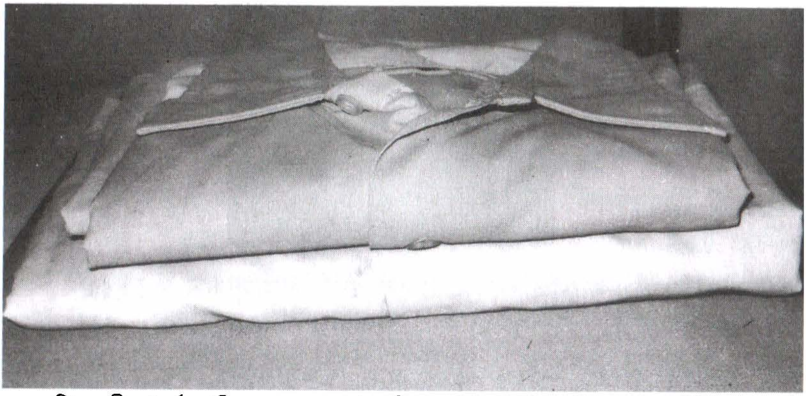
৭ই মার্চের ভাষণের পরই সিরাজগঞ্জে প্রতিষ্ঠিত হল মুক্তিযোদ্ধা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। কয়েকদিনের মধ্যেই কয়েকশ' যুবক যোগ দিল প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে। তাড়াশের নওগাঁর আনসার কমান্ডার আবদুর রহমান প্রশিক্ষক । সম্ভবত ১২ই মার্চে উক্ত ক্যাম্পে গাইবান্ধা থেকে আগত তৎকালীন পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে সিগন্যাল কোরের ল্যান্স নায়েক লুৎফর রহমান প্রশিক্ষক হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন। মহাসমারোহে প্রশিক্ষণ শুরু হল। আজও সেই লুৎফর রহমান সিরাজগঞ্জেই আছেন। সকলেই তাঁকে জানে লুৎফর রহমান অরুণ নামে। ইতোমধ্যে সিরাজগঞ্জের সে সময়ের এস.ডি.ও. শহিদ এ.কে.এম. শামসুদ্দিন সাহেব সিরাজগঞ্জের মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে যোগ দিলেন প্রতিরোধ-যুদ্ধে।



কিংবদন্তীর কর্ণেল শহিদ এ.কে.এম. শামসুদ্দিন S.D.O.

আমি আগেই বলেছি, শহিদ এ.কে.এম. শামসুদ্দিনের কথা। টাঙ্গাইলের কৃতিসন্তান স্বাধীন বাংলাদেশের গৌরব। এ.কে.এম. শামসুদ্দিনের নাম আজও সিরাজগঞ্জের মানুষের মনে গেঁথে আছে হারিয়ে যাওয়া অন্ধকারাচ্ছন্ন আকাশের ধ্রুবতারার মতো। যাঁর অদম্য সাহসিকতা, হাজার গুণে প্রলুব্ধ করেছিল যমুনা বিধৌত সিরাজগঞ্জের মানুষের জোয়ারে ভাসা ক্রুদ্ধ নদীর স্রোতকে। সে এক অভূতপূর্ব অবাক করা বাস্তব কাহিনী! এ কোন গল্প নয়! ইতিহাসের পাতায় সন্নিবেশিত এক অমোঘ সত্যি কাহিনী! ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চের বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ঘোষণার পর এই মহাপুরুষ নিজেকে সম্পূর্ণভাবে উজাড় করে দিয়েছিলেন বাঙালি জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে। সরকারী উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা হওয়া সত্ত্বেও যোগ দিয়েছিলেন মুক্তিযুদ্ধে। শুধু যুদ্ধে যোগ দেয়াই নয়, দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন সিরাজগঞ্জের প্রতিরোধ-যুদ্ধের অধিনায়কের। প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের দেখাশুনা থেকে শুরু করে যুদ্ধক্ষেত্রের বাংকার পর্যন্ত তাঁর বিচরণ এবং একজন পরিপক্ক সমর নায়কের ভূমিকা পালন করেছিলেন। আবদুল লতিফ মির্জা, মোজাফ্ফর হোসেন, লুৎফর রহমান অরুণ, আনোয়ার হোসেন পাহাড়ী, খ,ম, আকতারসহ শতাধিক নেতৃস্থানীয় মুক্তিযোদ্ধাদের সমর নায়ক হয়ে গড়ে তুলেছিলেন বাঘাবাড়ী, ঘাইটনা, ডাব বাগানসহ বিভিন্ন স্থানের প্রতিরোধ-যুদ্ধ। তখনকার সময়ে বগুড়ার আড়িয়াল খাঁ বাজারের সামরিক অস্ত্রাগারের লুণ্ঠিত অস্ত্রসহ শতাধিক পুলিশ ও আনসার তাঁর সঙ্গে যোগ দিয়ে বিশাল এক প্রতিরোধ বাহিনী গড়ে তুলেছিল। স্থানীয়ভাবে

তৈরি কামানসহ এই বাহিনী ২৫ শে এপ্রিল পর্যন্ত সিরাজগঞ্জকে শত্রু মুক্ত রাখতে সক্ষম হয়েছিল। যুদ্ধের পাশাপাশি তাঁর প্রশাসনিক দায়িত্ব পালনে একটুও পিছু-পা হননি তিনি। সারা মহকুমার শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে তিনি ছিলেন তৎপর।



কিংবদন্তীর কর্ণেল শহিদ এ.কে.এম. শামসুদ্দিন S.D.O.-এর কাপড়, যা এখন মুক্তিযোদ্ধা জাদুঘরে সংরক্ষিত

মুক্তিপাগল এ মানুষটি একজন দক্ষ সমর অধিনায়কের ভূমিকায় অস্থির হয়ে একসময় ভারতে গিয়েছিলেন অস্ত্রের সন্ধানে। কিন্তু সেখানে তিনি হয়েছিলেন অপমানিত। ফিরে এসে আর কখনও ভারতে যাওয়ার চিন্তা করেন নি। ২৫শে এপ্রিল সিরাজগঞ্জ শহরে পাকসেনারা প্রবেশের পর তিনি গা ঢাকা দিয়ে টাঙ্গাইলে তাঁর জন্মস্থানে গিয়েছিলেন। পরবর্তীতে ১৮ই মে তিনি কিছু নিকট-আত্মীয়ের ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে পাকিস্তান আর্মির হাতে গ্রেফতার হন। ১৯শে এপ্রিল দিবাগত রাতে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টর ভিতরে তাকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়। পতন ঘটে স্বাধীন বাংলার আকাশের এক উজ্জ্বল নক্ষত্রের। সিরাজগঞ্জের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস শামসুদ্দিন এস.ডি.ও. কে ছাড়া প্রশ্নই ওঠে না।

আমি ১৯৬৬ সালে হরিণা বাগবাটী হাইস্কুল থেকে ১ম বিভাগে এস.এস.সি. পাশ ক'রে সিরাজগঞ্জ কলেজে ভর্তি হই। আগেই ১৯৬৫ সালে পাকভারত যুদ্ধের সময় পূর্ব-পাকিস্তানকে অরক্ষিত রেখে পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী ভারতের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। পূর্ব-পাকিস্তানের প্রতি এইরূপ বৈষম্যমূলক আচরণ দেখে তখন থেকেই পাকিস্তানের প্রতি বৈরী ভাব তৈরি হয় আমার মাঝে। আস্তে আস্তে বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হই। কলেজে ভর্তি হওয়ার পর প্রগতিশীল ছাত্র সংগঠন পূর্ব-পাকিস্তান ছাত্রলীগের রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ি। সেই সুবাদে তৎকালীন ছাত্রনেতাসহ আওয়ামী লীগের

নেতৃবর্গের সাথে ওঠা-বসা এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে পড়ি। বঙ্গবন্ধুর ছয় দফা এবং ছাত্রসংগ্রাম পরিষদের ১১ দফাসহ সকল আন্দোলনের সাথেই জড়িত হই।

সর্বদলীয় ছাত্রঐক্য সংগ্রাম পরিষদ থেকে শুরু করে স্বাধীন বাংলা ছাত্রসংগ্রাম পরিষদের সকল কর্মকাণ্ডের পুরোভাগেই নিজেকে সম্পৃক্ত করি।

যুদ্ধের প্রস্তুতিলগ্নে সিরাজগঞ্জ কলেজ মাঠের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রশিক্ষণ চলছে জোরেসোরে। তৎকালীন ছাত্রনেতারা যথাক্রমে আবদুল লতিফ মির্জা, সিরাজুল ইসলাম খান, আবদুর রউফ পাতা, মোজাফ্‌ফর হোসেন, মহিউদ্দিন খান আলমগীর, আজিজুল হক বকুল, আবদুল হামিদ তাং এবং বিমলকুমার দাস, লুৎফর রহমান মাখন, মঞ্জু ভূঁইঞা, হাতেমউজ্জামান ভোলা, ইসাহাক আলী, গোলাম কিবরিয়া, আমির হোসেন খান, আনোয়ার হোসেন পাহাড়ী, ফজলুল মতিন মুক্তা, জাকির হোসেন, খ.ম. আকতার, জাহাঙ্গীর আলম তারা, আলী ইমাম তৌহিদ, ফ্যান্টোমাস বাবলু, টি.এম. শামীম (পান্না) সহ আরও অনেক মুক্তিযোদ্ধা। প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সিএনসি মোজাফ্‌ফর হোসেন, ডেপুটি কমান্ডার-ইন-চিফ মাসুদ। রীতিমত প্রশিক্ষণ চলছে। প্রশিক্ষক লুৎফর রহমান অরুণের সাথে ছিল রাজশাহী থেকে আগত গেরিলা রবিউল। এস. ডি. ও. শামসুদ্দিন সাহেব প্রতিদিন কলেজ মাঠে প্রশিক্ষণ পর্যবেক্ষণ করতে আসতেন এবং ছাত্র নেতাদের সাথে বৈঠক ক'রে পরবর্তী কার্যক্রম নিয়ে আলোচনায় ব্যস্ত থাকতেন। ইতোমধ্যে তিনি প্রত্যেক থানার ওসিদের নির্দেশ প্রদান ক'রে অস্ত্রাগার খুলে দিয়ে ছাত্রদের সাথে একাত্ম হয়ে মুক্তিযুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে বলেন। সকল থানায় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করেন। অন্যদিকে, আলী ইমাম তৌহিদ, ফান্টোমাস বাবলু, সানোয়ার হোসেন, আলতাফ হোসেন ও পান্নাসহ আরও কয়েকজন কামান তৈরিতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। কালীবাড়ি রোডের আবু মেকারের ওয়ার্কশপে কামান তৈরির কার্যক্রম শুরু হয়। কলেজ ল্যাবে কামানের গোলা তৈরি করছিলেন তৌহিদ ও সানোয়ার। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সাবেক সদস্য নিরুর দেয়া কিছু বৈজ্ঞানিক তথ্যের ভিত্তিতে এই কামান শুরু হয়। কয়েকদিনের প্রচেষ্টায় তৈরি হয়ে গেল ২" ব্যাসের কামান। কামানের পরীক্ষা করা দরকার। অসমাপ্ত কামানের টেস্ট ফায়ারিং-এ হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করা দরকার। এই দুঃসাহসী কাজটির জন্য এগিয়ে আসেন টি. এম. শামীম পান্না। পরীক্ষা শেষ হলো কামানের। সিরাজগঞ্জ স্টেডিয়ামের ভেতরে পরীক্ষা হয় কিন্তু কামানের গোলা পিছন দিক দিয়ে বের হয়ে যায়।

অন্যদিকে, মোক্তার পাড়ায় কিছু উৎসাহী যুবকেরা স্থাপন করে 'জয়বাংলা বেতার কেন্দ্র'। বেতার কেন্দ্রের উদ্যোক্তা ছিলেন মোতাহার হোসেন জ্যোতি, আবদুস সাত্তার আলফা ও সাংবাদিক আনোয়ার হোসেন শিকদারসহ আরও কয়েকজন। এই বেতারকেন্দ্র থেকে সম্প্রচারিত অনুষ্ঠান সেদিন সিরাজগঞ্জের মানুষের মাঝে এক নতুন মাত্রা সংযোজন করে। যাদুঘরে আজও সংরক্ষিত আছে বেতার কেন্দ্রের ট্রান্সমিটারটি। কামান টেস্ট ফায়ার করতে গিয়ে স্টেডিয়ামের ওয়াল ভাঙে পরবর্তীতে কওমী জুট মিলে ওয়ার্কসপে এই কামানের নতুন সংস্করণ করা হয় ইঞ্জিনিয়ার হাবিবুর রহমানের তত্ত্বাবধানে।

প্রশিক্ষণের সাথে চলছে অস্ত্র সংগ্রহের কাজ। থানা থেকে সরবরাহকৃত অস্ত্রের মধ্যে ৩০৩ রাইফেল ছাড়া আর কিছুই ছিল না। ইতোমধ্যেই বগুড়ার আড়িয়াল খাঁ বাজারে অবস্থিত তৎকালীন পাকসেনাদের অস্ত্রের গোডাউন লুণ্ঠিত হয়েছিল। সেই অস্ত্র অনেক ঘরে ঘরে পৌঁছে যায়। তারই কিছু অস্ত্র গোলা-বারুদ নিয়ে তৎকালীন ই.পি.আর.-এর বেশকিছু সদস্য সিরাজগঞ্জে পৌঁছে। ভারী অস্ত্র না পেলেও মোটামুটি সাধারণ অস্ত্র নিয়েই প্রস্তুত হয় মুক্তিযোদ্ধারা। সাথে নিজেদের তৈরি ১২/১৩টি ২" ব্যাসের কামান। মোটামুটি রণসাজে সজ্জিত মুক্তিযোদ্ধারা। এবার প্রতিরোধের পালা।

ইতোমধ্যে ২৫ শে মার্চের কালরাত্রির পরে পাকহানাদার বাহিনী ছড়িয়ে পড়েছে সারাদেশে। তখন ঢাকা থেকে সিরাজগঞ্জ আসবার রাস্তা ছিল তিনটা। একটা নর্থবেঙ্গল হাইওয়েজ, আরেকটা ঢাকা মোমেনশাহী মহাসড়ক দিয়ে টাঙ্গাইল হয়ে নদী-পথে সিরাজগঞ্জ এবং অন্যটি ঢাকা ময়মনসিংহ জামালপুর হয়ে রেলযোগে সিরাজগঞ্জ।

শোনা যায়, পাকসেনারা বাঘাবাড়ী হয়ে এক গ্রুপ টাঙ্গাইল হয়ে আরও একদল সৈন্য সিরাজগঞ্জ আসছে। এস.ডি.ও. শামসুদ্দিন সাহেবের তত্ত্বাবধানে লতিফ মির্জা, মোজাফফর হোসেন, লুৎফর রহমান অরুণ, তৎকালীন বাকসুর জি.এস. আবদুস সামাদ সাহেবের নেতৃত্বে একদল মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে বাঘাবাড়ীতে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়। বাঘাবাড়ীতে তখন ব্রিজ ছিল না। ফেরিঘাট ছিল। ফেরিঘাটের এপারে মুক্তিযোদ্ধারা ডিফেন্স নিয়েছিল। ২২শে এপ্রিল বিকেল বেলায় পাকসেনারা বাঘাবাড়ীতে আসে। ফেরিতে উঠেই ভারী অস্ত্র আর্টিলারী (আর্টারী) ফায়ার ওপেন করল। বিকট সেই আওয়াজে মানুষ ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে বাড়ি-ঘর ছেড়ে পালাল। প্রচণ্ড চাপ ও ভয়াবহতার মুখে মুক্তিযোদ্ধারা ডিফেন্স ছেড়ে দিয়ে উল্লাপাড়ায় চলে আসে। এবং লতিফ মির্জার নির্দেশক্রমে ঘাইটনা ব্রিজে অবস্থান নেয়। এস.ডি.ও. শামসুদ্দিন আগেই সেখানে অবস্থান নিয়েছিলেন। তিনি ঘাইটনা ব্রিজে অবস্থান করার নির্দেশ দিয়ে

অস্ত্র-গোলাবারুদসহ আরও কিছু আনসার নিয়ে জামতৈল হয়ে ঘাইটনা ব্রিজে আসবেন ব'লে চ'লে যান। লতিফ মির্জা, মোজাফ্‌ফর হোসেন, আবদুস সামাদ, হাবিবুল্লাহ, ভূঁয়াপুরের হাবিব, সেনাসদস্য মহিউদ্দিন, রবিউল গেরিলা, অধ্যাপক শাহজাহান আলী, আবদুর রহমান, আজহার মাস্টার, আনোয়ার হোসেন পাহাড়ী, ব্যাংক কর্মকর্তা মোস্তফা কামাল, ফজলুল মতিন মুক্তা, ফজলুল হক, নায়েব আলীসহ একটি বড় দল নৌকাযোগে ঘাইটনা ব্রিজের কাছে অবস্থান নেয়। এই দৃশ্য দেখে আশেপাশের লোকজন অদম্য উৎসাহে মেতে ওঠে। এলাকার লোকজন বাড়ি বাড়ি থেকে চিড়ামুড়ি ইত্যাদি খাবার সংগ্রহ ক'রে সরবরাহ করতে থাকে। সুন্দরভাবে ডিফেন্স নেয়ার পর বেলা ২টার দিকে আসলো মিলিটারি ভর্তি ট্রেন। ট্রেনটি উল্লাপাড়া থেকে ছেড়ে আসে। ব্রিজের ওপারে ট্রেন থামায় পাকসেনারা। তাদের এদেশীয় সহযোগী বিহারীরা মহা-উল্লাসে ব্রিজে ওঠে এপারে আসার জন্য।

এপারে অবস্থানরত মুক্তিযোদ্ধারা এই ক্ষণটির জন্যই অপেক্ষা করছিল। পাকহানাদার বাহিনীর কাছে ছিল মর্টারসহ অত্যাধুনিক অস্ত্রসস্ত্র। মুক্তিযোদ্ধারা ফায়ার ওপেন করল। সাথে সাথে গর্জে উঠল হানাদার বাহিনীর কামান। অতর্কিত হামলার কারণে পাকহানাদার বাহিনী দিশেহারা হয়ে পিছু হঠতে বাধ্য হলো। রেখে গেল তাদের ২০ জন সহযোদ্ধার লাশ ও স্থানীয় বিহারীদের মৃতদেহ ঘাইটনা রেল ব্রিজের নিচে, করতোয়া নদীর পানিতে। সঙ্গে নিয়ে যায় তাদের কিছু সংখ্যক আহত সেনা ও তাদের দেশীয় সৈনিক। এক ঐতিহাসিক বিস্ময়ের সৃষ্টি হলো সিরাজগঞ্জের ঘাইটনা ব্রিজে। তৎকালীন বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম শক্তিশালী পাকিস্তান সেনাবাহিনী পরাজিত হলো অগোছানো নব প্রশিক্ষিত একদল আনাড়ী সৈনিক বীর-বাঙালীর অসীম সাহসী পদক্ষেপের কাছে। হানাদার বাহিনী পিছু হটে গিয়ে উল্লাপাড়ায় শুরু করে হত্যাযজ্ঞ ও জ্বালাও-পোড়াও কর্মকাণ্ড। সেদিনের সে যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বীর-মুক্তিযোদ্ধা আবদুল লতিফ মির্জা, ওস্তাদ লুৎফর রহমান অরুণ, আবদুস সামাদ, আনোয়ার হোসেন পাহাড়ী, মোজাফ্‌ফর হোসেন মোজাম, রবিউল গেরিলাসহ আরও অনেকের বীরত্বগাঁথা কাহিনী ইতিহাসে অমর হয়ে থাকবে।

মনে রাখতে হবে, সেদিনের CNC মোজাফফর হোসেন মোজাম ও Deputy CNC মাসুদুর রহমান মাসুদ (উভয়েই বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত মেজর)-এর অভাবনীয় ভূমিকার কথা।

এর আগেই ২৭শে মার্চ আরও একটা অভাবনীয় যুদ্ধ হয়। টাঙ্গাইলের পোড়াবাড়ী হয়ে লঞ্চযোগে পাক-আর্মির সিরাজগঞ্জ আসার খবর পেয়ে সিরাজগঞ্জের কলেজমাঠে প্রশিক্ষণরত ছাত্রনেতাদের সম্মিলিত সিদ্ধান্ত

মোতাবেক সিরাজগঞ্জ যমুনার পারে ডিফেন্স নেয় একদল মুক্তিযোদ্ধা, আর একদল মুক্তিযোদ্ধা তৎকালীন রেলঘাটে। মোজাফ্‌ফর হোসেন, লুৎফর রহামন অরুণ, ইসাহাক আলীর নেতৃত্বে রবিউল গেরিলাসহ একদল মুক্তিযোদ্ধা স্পীড বোর্ডযোগে পোড়াবাড়ীতে গিয়ে সেখানে অপেক্ষমান ৭টা লঞ্চের (মিলিটারীদের সিরাজগঞ্জ নিয়ে আসার জন্য অপেক্ষা করছিল) সারেংদের বাধ্য করে সিরাজগঞ্জে নিয়ে আসতে। ফলে পাক-আর্মিরা তখন সিরাজগঞ্জে আসতে পারে নি।

ঐ লঞ্চে কিছু 'শরণার্থী' আসে। সিরাজগঞ্জের সাধারণ মানুষ জানত না, কারা ঐ লঞ্চ নিয়ে আসছে। সকলের ধারণা ছিল পাকসেনারা লঞ্চযোগে আসছে। একসঙ্গে ৭টি লঞ্চ হেডলাইট জ্বালিয়ে আসছে। জনসাধারণ ভীত সন্ত্রস্ত। উৎফুল্ল জনতা লাঠি, ফালা, বল্লম, তীর-ধনুক ও ইটপাটকেল নিয়ে নদীর পাড়ে সমবেত ছিল। লঞ্চগুলো পাড়ের কাছে আসতেই শুরু হলো ইট-পাটকেল ছোঁড়া। সে এক অস্বাভাবিক অবস্থা! স্পীড-বোটে আসা মুক্তিযোদ্ধারা জোরে জোরে চিৎকার করে 'জয় বাংলা' শ্লোগান দিতে দিতে লঞ্চের 'হেড লাইটের' সামনে আসলে দৃশ্যমান হওয়ায় থেমে যায় ইট-পাটকেলের যুদ্ধ। সেম সাইড থেকে রক্ষা পায় মুক্তিযোদ্ধারা। এর পরের প্রতিরোধ-যুদ্ধের বর্ণনাগুলো ইতোমধ্যেই লিপিবদ্ধ করেছি। ২৩ শে এপ্রিল আবারও বাঘাবাড়ীতে যাবার পর ২৪শে এপ্রিল সেখান থেকে ডাব বাগানে অবস্থান এবং শত্রু-সেনাদের সাথে প্রচণ্ড প্রতিরোধ-যুদ্ধের মোকাবেলা ক'রে যুদ্ধের ভয়াবহতার কথা বিবেচনা ক'রে সেদিন মুক্তিযোদ্ধারা রণে বিরতি দিতে বাধ্য হয়েছিল। আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত পাকিস্তানী-সেনাদের মোকাবেলায় কেবল থ্রি নট থ্রি (৩০৩) রাইফেল এবং স্থানীয়ভাবে তৈরি ২" ব্যাসের কামান নিয়ে টিকে থাকা ছিল অসম্ভব ব্যাপার। সেদিনের অদম্য সাহসই যুগিয়েছিল যুদ্ধের শক্তি। যুদ্ধের এ পর্যায় পর্যন্ত আসতে অসামান্য অবদান রেখেছিলেন যে-সমস্ত ব্যক্তিবর্গ এবং সংগঠন, তাঁদের কথা না লিখলে অসম্পূর্ণ থেকে যাবে সিরাজগঞ্জের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস। উল্লেখ করতেই হবে, তৎকালীন আওয়ামী ও ছাত্রনেতৃবর্গসহ অনেকের সাধারণ থেকে অসাধারণ হয়ে যাওয়ার কথা। যেমন :

আওয়ামী লীগ মুহকমা শাখার নেতৃবর্গ সর্বজনাব– (১) মোতাহার হোসেন তালুকদার (২) দবির উদ্দিন আহম্মদ (৩) সৈয়দ হায়দার আলী (৪) আব্দুল মোমেন তালুকদার (৫) শহিদুল ইসলাম (৬) রওশনুল হক (৭) ডা: আবুহেনা (৮) আনোয়ার হোসেন রতু (৯) আমির হোসেন ভুলু (১০) আমিনুল ইসলাম চৌধুরীসহ আরও অনেক গুণীজনদের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

সিরাজগঞ্জ মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রসংসদের '৬০-এর দশকের ভূমিকা '৬৯-এর গণ-আন্দোলন এবং সবশেষে '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ এবং মহান স্বাধীনতা অর্জনের আন্দোলকে ধাপে ধাপে যাঁদের নেতৃত্বে এগিয়ে নেয়া হয়েছিল, তাঁদের কথা অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে ইতিহাসের পাতায়। ১৯৬২ থেকে '৬৫ পর্যন্ত সিরাজগঞ্জ কলেজের ছাত্রলীগের তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য প্রভাব না থাকলেও আমির হোসেন ভুলুর ঐকান্তিক চেষ্টায় ধীরে ধীরে অসম্ভব প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে গড়ে ওঠে প্রগতিশীল ছাত্র রাজনীতির সংগঠন পূর্ব-পাকিস্তান ছাত্রলীগ। ১৯৬৬ সালে আমির হোসেনের করাচীতে চলে যাওয়ার পরে '৬৬-'৬৭ সালের কলেজ ছাত্র সংসদ নির্বাচনে রুহুল আমিন ইসমাঈলের পরিষদের প্যানেল পূর্ণ বিজয়ের মাধ্যমেই পূর্ণাঙ্গ যাত্রা শুরু পূর্ব-পাকিস্তান ছাত্রলীগের। যথাক্রমে '৬৭-'৬৮ সালে আবদুল লতিফ মির্জা, আয়নুল হক পরিষদ, '৬৮-'৬৯ সালে আবদুল বারী শেখ, সিরাজুল ইসলাম খান পরিষদ, '৬৯-'৭০ সালে আবদুর রউফ পাতা-বিমল কুমার দাস পরিষদ এবং সবশেষে '৭০-'৭১ সালে সোহরাব আলী সরকার ও আমির হোসেন খান পরিষদ পূর্ণ প্যানেলে বিজয় লাভ করে তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তান ছাত্রলীগ। ছাত্রলীগের ঐসব বিজয়ের ফলাফল শুধু কলেজ বা ছাত্র অঙ্গনেই প্রতিফলিত হয় নি বরং সারা মহকুমার গ্রামেগঞ্জের কলেজ ও বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছিল সাধারণ মানুষের মাঝে। বঙ্গবন্ধুর ছয় দফা এবং ছাত্রদের ১১ দফার মর্মবাণী পৌঁছে দিয়েছিল সাধারণের মনে। যার ফলে অর্জিত হয় বাংলাদেশের স্বাধীনতা।

'৬৯-এর গণআন্দোলনের প্রাক্কালে সারাদেশের মত সিরাজগঞ্জেও তৎকালীন ছাত্রনেতা ও কলেজ সংসদের নির্বাচিত জি. এস. জনাব সিরাজুল ইসলাম খানকে আহ্বায়ক করে গঠিত হয়েছিল সর্বদলীয় ছাত্রঐক্য সংগ্রাম পরিষদ। উক্ত পরিষদের অগ্রণী ভূমিকায় এবং আওয়ামী লীগের সহযোগিতায় গড়ে উঠেছিল দুনিয়া কাঁপানো গণঅভ্যুত্থান, মুক্ত হয়েছিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব। সম্ভব হয়েছিল '৭০-এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ বিজয়। ছাত্র-আন্দোলন, গণ-আন্দোলন, গণঅভ্যুত্থান, নির্বাচনে বিজয়, এসবেরই পিছনে ছিল উল্লিখিত সংগঠনগুলোর অকৃত্রিম ভূমিকা।

'৭১-এর নির্বাচনের পর বঙ্গবন্ধুর অসহযোগ আন্দোলন থেকে শুরু ক'রে মুক্তিযুদ্ধ শুরুর আগ-পর্যন্ত যে-সব সংগঠনের ভূমিকা ছিল অসামান্য, তার মধ্যে স্বাধীন-বাংলা ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ ছিল অন্যতম। সারাদেশের মতো সিরাজগঞ্জেও মুহকমা ছাত্রলীগের নেতাদের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছিল স্বাধীন-বাংলা ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ।

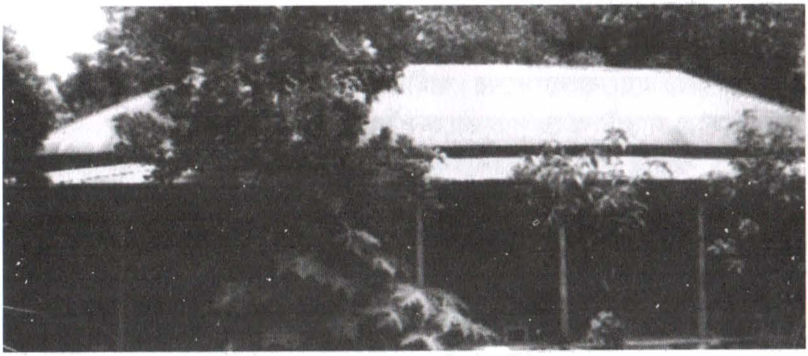
’৬৯-এর গণআন্দোলন, ’৭০-এর নির্বাচন এবং ’৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ, এসব কিছুতেই যাঁদের অবদান এবং সংশ্লিষ্টতা ছিল, তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিল স্বাধীন-বাংলা ছাত্র-সংগ্রাম পরিষদের সদস্যবৃন্দ। বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ঘোষণার পর সিরাজগঞ্জে গঠিত হয় স্বাধীনবাংলা ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ। তৎকালীন ছাত্রনেতা মহিউদ্দিন মোহাম্মদ আলমগীর ছিলেন মহকুমা ছাত্রলীগের সভাপতি। আজিজুল হক বকুল ছিলেন সেক্রেটারী। ঐ সময়েই গঠিত হয় স্বাধীন-বাংলা ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ। তবে আগে থেকেই ছাত্রলীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের ভূমিকা ছিল অভূতপূর্ব। ’৬৯-’৭০-এর গণআন্দোলনের সময় আওয়ামী লীগসহ ছাত্রলীগের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ সবাই ছিলেন জেলখানায় বন্দী। এই দুঃসময়ে আজিজুল হক বকুলসহ অন্যরা যে অসাধারণ ভূমিকা পালন করেন, তা আজও অবিস্মরণীয় হয়ে আছে। ঐ সময়ে কোনো বড় নেতাই বাইরে ছিলেন না। ছাত্রলীগসহ সকল প্রগতিশীল সংগঠনগুলোর কর্মকাণ্ড প্রায় বন্ধই ছিল। আন্দোলনকে গতিশীল করার জন্য চাই সংগ্রাম। এলো রবীন্দ্র-জয়ন্তী। পৌর-মিলনায়তনে ব্যবস্থা করা হল জয়ন্তী পালন অনুষ্ঠানের। আজিজুল হক বকুল (হুলিয়ার আসামী), আমি লুৎফর রহমান দুদু, মহিউদ্দীন আলমগীর ও আমিনা বেগম মিনা এই ক’জনই উদ্যোক্তা। শুরু হলো অনুষ্ঠান। কিছুক্ষণ পরই এলো পুলিশ। আমরা কোনো রকমে পিছনের দেয়াল টপকিয়ে গ্রেফতার এড়াতে সক্ষম হলাম। এর কিছুদিন পরই বঙ্গবন্ধু মুক্তি পেলেন কারাগার থেকে। আইয়ুব খান ক্ষমতা ছাড়লেন। জনগণের ভোটাধিকার দেয়া হলো।

’৭০-এর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলো। নিরঙ্কুশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা পেল পূর্ব-পাকিস্তান আওয়ামী লীগ। শুরু হলো ক্ষমতা হস্তান্তর নিয়ে তালবাহানা। বঙ্গবন্ধুর অসহযোগ আন্দোলন অবশেষে ৭ই মার্চের সেই দিন। শুরু হল স্বাধীনতা সংগ্রাম। স্বাধীনতা সংগ্রাম থেকে যুদ্ধ। এই সবকিছুতেই সম্পৃক্ত ছিলাম আমরা সবাই। সেদিনের সেই স্বাধীন-বাংলা সংগ্রাম পরিষদের ভূমিকা ছিল অবিশ্বাস্য ঘটনা। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আজিজুল হক বকুল ও আমিনা বেগম মিনা ছিল সম্পৃক্ত। ইতোমধ্যে আজিজুল হক বকুল ও মিনা বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হন এবং একসাথে ভারতে চলে যান। মাইনকাচর থেকে রৌমারী ক্যাম্পে এ দু’জনের আসা-যাওয়া এবং শেষ পর্যন্ত দেশের মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য অস্ত্র রৌমারী ক্যাম্প থেকে নৌকাযোগে সিরাজগঞ্জ পর্যন্ত বয়ে আনত ওরা। এ কাজটা ছিল একটা দুঃসাহসিক পদক্ষেপ, কারণ রংপুর থেকে শুরু ক’রে সারা যমুনা নদীতে ছিল তখন পাকসেনাদের নিয়মিত টহল। অত্যাধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত গানবোটের চোখকে ফাঁকি দিয়ে নিয়ে আসতো অস্ত্র। রূপকথার গল্পের

মতো শোনালেও এটাই ছিল বাস্তবচিত্র। যুদ্ধক্ষেত্রে অস্ত্র ও গোলাবারুদ হলো প্রধান উপকরণ, সেই মুখ্য কাজটি তাঁরা করতেন নির্ভয়ে। আজও আজিজুল হক বকুল ও মিনা কালের সাক্ষী হয়ে বেঁচে আছেন এই প্রিয় মাতৃভূমিতে, বিচরণ করছেন অনেকটা অবহেলিত হয়ে। বেঁচে আছেন মহিউদ্দিন আলমগীর, কিন্তু কে তার খবর রাখে? এই মহিউদ্দিন মোহাম্মদ আলমগীরই ২৩ শে মার্চ '৭১, বিএ, কলেজ মাঠে স্বাধীন-বাংলার পতাকা ওড়ান। এ মঞ্চ থেকেই ঘোষণা করা হয় বাংলাদেশের স্বাধীনতা এবং কলেজ মাঠে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধারা স্যালুট ক'রে পতাকাকে সম্মান প্রদর্শন করেন।

৮ই মার্চ সংগ্রাম পরিষদ গঠন, কলেজ মাঠে প্রশিক্ষণ-কেন্দ্র স্থাপনের পর এস.ডি.ও. সাহেবের নির্দেশে সকল থানা থেকে অস্ত্র সরবরাহ ক'রে প্রশিক্ষণ দেয়া শুরু হয়। আমি সিরাজগঞ্জ থেকে ৬টি ডামি রাইফেল নিয়ে চলে আসি আমার নিজ গ্রামে। কাজীপুর থানার শুভগাছা ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত দোয়েল মৌজায় ছিল তখন পাক-হাট নামে একটি হাট। ঐ পাক-হাটের উপর এক জনসভা আহ্বান করি। সম্ভবত ১২ই এপ্রিল উক্ত জনসভার মাধ্যমে গঠিত হয় একটি আঞ্চলিক সংগ্রাম পরিষদ। ঐ পরিষদের আহ্বায়ক আমাকে নিযুক্ত করা হয়। ঐ দিনটি অর্থাৎ ১২ই এপ্রিল পাক-হাটের নাম পরিবর্তন করে বাংলা-বাজার নামকরণ করি আমি নিজে। স্থাপন করা হয় মুক্তিযোদ্ধা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। ২/৩ দিনের মধ্যে প্রায় চারশ' ছাত্র-যুবক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ভর্তি হয়। পাকিস্তান-সেনাবাহিনীর সিগন্যাল কোরের সদস্য আবদুস সাত্তার চাকলাদার প্রশিক্ষণের ২ দিন পর যোগ দিলেন সারদা পুলিশ একাডেমির প্রশিক্ষক স্বপক্ষ ত্যাগী নির্ভিক সৈনিক আবদুর রশীদ। বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার মাঝে চলছে প্রশিক্ষণ। আশেপাশের গ্রামের লোকজন নিজেরাই উদ্যোগী হয়ে নঙ্গরখানা খুলে দিলেন প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য। ওদিকে কাজীরপুর থানা সদরে মরহুম শাহজাহান আলীর নেতৃত্বে গঠিত হয় আরও একটি সংগ্রাম পরিষদ। স্থাপিত হয় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। সিরাজগঞ্জের মুক্তিযোদ্ধারা বাঘাবাড়ী, ঘাইটনা এবং ডাব বাগানসহ বিভিন্ন স্থানে প্রতিরোধ-যুদ্ধে লিপ্ত থাকে। সারা মহকুমার সকল স্তরের মানুষ তখন যুদ্ধংদেহী। আমরাও প্রস্তুত হলাম যুদ্ধের জন্য। কিন্তু সেইজন্য প্রয়োজন অস্ত্রের। মাত্র কয়েকটি রাইফেল নিয়ে রওনা দিলাম বাঘাবাড়ীর দিকে। ২৫শে এপ্রিল। ইতোমধ্যে প্রচণ্ড চাপের মুখে মুক্তিযোদ্ধারা বাঘাবাড়ী থেকে পিছু হটতে শুরু করে। ২৫শে এপ্রিল সিরাজ গঞ্জে আর্মি প্রবেশ করে। মুক্তিযোদ্ধারা শহর ছেড়ে বিভিন্ন দিকে চলে যায়। ইতোপূর্বেই ১৪ই এপ্রিল মনসুর আলী সাহেব সিরাজগঞ্জ এসে নেতা-কর্মীদের ভারতে যাওয়ার নির্দেশ দিয়ে চলে যান। সিরাজগঞ্জ তখন হয়ে পড়ে নেতা-শূন্য।

কেবল ছাত্রনেতারাই তখন দিক-নির্দেশনা দিতে থাকেন। ২২-২৩শে এপ্রিলের মধ্যে মোতাহার হোসেন তালুকদার, সৈয়দ হায়দার আলী, মোমেন তালুকদারসহ প্রায় সব নেতারাই ভারতে চলে যান। ইতোমধ্যে ১৭ই এপ্রিল মুজিবনগরে প্রবাসী সরকার গঠন করা হয়েছে।



ড. জি. আই. খান সাহেবের বাড়ি (ট্রানজিট ক্যাম্প)

২৫শে এপ্রিল আমি বাংলাবাজার থেকে ১৫/১৬ জন সঙ্গীসহ রওনা দিই বাঘাবাড়ীর দিকে। পথিমধ্যে ছোন গাছায় দেখা হল লতিফ ভাইয়ের সাথে। লতিফ ভাইসহ অন্য সকলে কিছু অস্ত্রসস্ত্রসহ চলে এসেছেন । কারণ শহরে তখন আর্মিরা প্রবেশ করেছে। লতিফ মির্জা, মোজাম, আজিজ মির্জা, আবদুর রউফ পাতা, বিমল কুমার দাস, জহুরুল ইসলাম মিন্টু, লুৎফর রহমান অরুণ, আমিনুল ইসলাম চৌধুরীসহ প্রায় ৩০/৩৫ জন মুক্তিযোদ্ধা চিলগাছায় রফিকুলদের বাড়িতে অবস্থান নিলাম। ৪/৫ দিন ওখানে থাকার পর প্রায় ৩৭টার মত অস্ত্র ও কিছু গোলাবারুদ রফিকুলের জিম্মায় মাটির নিচে মজুদ করে রেখে আমরা চলে যাই কাজীপুরের লক্ষ্মীপুর গ্রামে, আমার মামা ড. জি. আই. খান সাহেবের বাড়িতে। ৫ই এপ্রিল আমি, লুৎফর রহমান অরুণ, জিন্নাহ, ফিরোজ ভূঁইয়া, এবং খ, ম, আকতারসহ ৫ জনের প্রথম দলটি ভারতের মাইনকাচরের উদ্দেশ্যে পদব্রজে রওনা হই। লতিফ মির্জা ঐ বাড়িতেই অবস্থান করেন এবং বাড়িটাকে ট্রানজিট ক্যাম্প হিসেবে ব্যবহার করেন। আমরা ৩ দিন পর মাইনকারচরে পৌঁছালাম। ওখানে পেলাম তৎকালীন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র নেতা আবুল কাশেম নূরে এলাহীকে। আরও পেলাম আমার ছোট ভাই আবদুস সাত্তার, নূরুল ইসলাম, সোহরাব হোসেনসহ আরও কয়েকজনকে। কাশেম ভাইয়ের কাছে খবর পেলাম পশ্চিম-দিনাজপুরের বালুরঘাটে আমাদের সিরাজগঞ্জের নেতারা অবস্থান করছেন। ভারতীয় বি. এস. এফ.-এর কাছ থেকে রোড পাশ সংগ্রহ

করে আমি, লুৎফর রহমান অরুণ, জিন্নাহ, ফিরোজ ভূঁইঞা, খ,ম, আক্তার ও কাশেম ভাইসহ মোট ছয়জন, বাস ও ট্রেনযোগে পশ্চিম দিনাজপুরের বালুরঘাটের দিকে রওনা হলাম। বাকী কয়জন দেশের ভিতর দিয়ে হেঁটেই রওনা দিল। আমাদের সে-যাত্রার কিছু কাহিনী না বললেই নয়। আমাদের হাতে কোন টাকা ছিল না। সামান্য যা কিছু ছিল তা দিয়ে বাস-ভাড়া ও রাস্তায় ফকিরাগঞ্জ ঘাটে এবং ধুবড়িতে ভাত খেতে হয়েছিল। বিনা টিকেটে রেলগাড়ীতে চড়লাম ধুবড়ি থেকে। সাথে বি. এস. এফ.-এর পাশ থাকায় ট্রেনে কোন সমস্যা হল না। বিপদে পড়লাম পেটের জ্বালায়। একটানা বিকাল ৪টা থেকে ট্রেন চলায় পরদিন দুপুর ১টার দিকে শিলিগুঁড়ি জংশনে ২ মিনিটের বিরতি। আমরা শিলিগুঁড়ি জংশনে নেমে পানি খেয়ে আবার ট্রেনে চড়ে বসলাম। আমাদের অবস্থা দেখে একই কামরায় থাকা এক ভারতীয় হিন্দিভাষী পরিবার তাদের সঙ্গে আনা কয়েকটা সাদাপুরী আমাদেরকে দিল। আমরা গোগ্রাসে তা ভক্ষণ করে ঐ পরিবারটার জন্য প্রশংসা করলাম।

ঘুম আসার কোন কারণ ছিল না, কারণ বিগত ৩০ ঘণ্টায় একমাত্র পুরী আর জংশনের ফ্রি পানি ছাড়া কারো পেটে আর কিছু পড়েনি। বাউশি জংশনে নেমে আমার পকেটে দশ পয়সার একটা ভারতীয় মুদ্রা আবিষ্কার করলাম। তাই দিয়ে একটা বনরুটি কিনে সবাই খেয়ে পেটের জ্বালা মেটানোর ব্যর্থ চেষ্টা করলাম। জংশনের বেয়াড়া হাতিসম মশার কামড় এবং রেল পুলিশের জুতার গুঁতায় আমাদের ঘুমানোর সকল চেষ্টা ব্যর্থ হল। তিনটায় কালিগঞ্জের লোকাল ট্রেনে উঠলাম। পরদিন দুপুর ১২টার দিকে পৌঁছোলাম কালিগঞ্জ শহরে। ওখানে নেমে আমাদের কারও পা আর চলে না। একটা পুকুরে নেমে গোসল করে পুকুরপাড়ে রোদে বসে পরনের কাপড় শুকালাম, কারণ পরনের কাপড় ছাড়া আর কোন কিছুই আমাদের সাথে ছিল না। আমার মিতার (অরুণের) হাতে ১টা জাপানী কেমি ঘড়ি ছিল। ভারতে তখন কোন বিদেশী পণ্য পাওয়া যেত না, তাই ঘড়িটার দাম ছিল অনেক। পাকিস্তানী ৭০ টাকার কেসিঘড়ি পুরানো হলেও ভারতীয় ১০০ রুপিতে বিক্রি করে আমরা কম-দামী হোটেলে বসে জঠরজ্বালা নিবারণ করলাম। শহরের মধ্যে বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রী সমিতির অফিস, সেখানে গিয়ে তেমন কোন সাহায্য না পেয়ে ভারতীয় এম্বাসেডর গাড়ীতে ১৪ জন ঠাসাঠাসি করে বসে প্রতিজনে ৩ রুপি করে ভাড়া দিয়ে বালুরঘাটে যাই। বালুরঘাট এসে ডাক-বাংলোয় পেলাম মোতাহার হোসেন তালুকদার, এম.এন.এ. আব্দুল মোমেন তালুকদার এম.পি. সাহেবকে। জানতে পারলাম তাদের করুণ কাহিনী। দৈনিক মাত্র ২০ রুপি ভাতা পেতেন তাদের দৈনন্দিন খরচ মিটানোর জন্য। নিকটবর্তী কুরমাইলস্থ

(কামার পাড়া) ট্রেনিং ক্যাম্পে চলে গেলাম আমরা ৫ জন। কাশেম ভাই থেকে গেলেন বালুরঘাটেই।

আমরা কুরমাইল ক্যাম্পে পেলাম সৈয়দ হায়দার আলী এম.পি.-কে। প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে ৩/৪ দিন প্রশিক্ষণ নেয়ার পর এলেন জাতীয় চার ছাত্রনেতা সর্বজনাব তোফায়েল আহম্মেদ, আবদুর রাজ্জাক, শেখ ফজলুল হক মনি ও সিরাজুল আলম খান, সাথে জেনারেল ওসমানী এবং আমাদের লতিফ মির্জা। লতিফ ভাইয়ের নির্দেশে আমরা কয়েকজন সন্ধ্যায় বালুরঘাট ডাক বাংলোর পাশে মাঠের মধ্যে অন্ধকারে অপেক্ষা করছিলাম। কিছুক্ষণ পর একটা খোলা জীপে করে আমাদের নিয়ে যাওয়া হল কালিগঞ্জ রেলস্টেশনে। সেখান থেকে ট্রেন যোগে শিলিগুঁড়ি আর্মির কনভয়ে করে জলপাইগুঁড়ি থেকে পাঙ্গা সেনা ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হয়। ওখানে পেলাম মোজাম ভাই, সামাদ ভাই, আজিজ মির্জা, ইসহাক আলী, শেখ আজিজ, মঞ্জু ভূঁইঞা, পান্না, বিমল দা, গোলাম কিবরিয়াসহ আরও অনেককে। মোট ৩২ জন। জলপাঁইগুড়ি জেলার পাঙ্গা নামক স্থানে এই ক্যাম্পটি স্থাপিত হয় ট্রানজিট ক্যাম্প হিসাবে। B.L.F-এর সদস্যদের প্রশিক্ষণের জন্যই এই ক্যাম্পটি স্থাপিত হয়েছিল। ভারতের দেরাদুন এবং আসামের হাফলং-এ স্থাপিত হয় ২টি ট্রেনিং ক্যাম্প। Indian Raw-এর নিয়ন্ত্রণে এই ট্রেনিং ক্যাম্প দুটি পরিচালিত হতো। পাঙ্গার নিকটবর্তী বাগডোগরা এয়ারপোর্টটি ব্যবহার হতো। এই দুই ক্যাম্পে যাদেরকে পাঠানো হতো তারা মোটামুটি সবাই শিক্ষিত, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। কঠিন সামরিক গেরিলা প্রশিক্ষণ শেষে আবার ফিরে আনা হতো পাঙ্গাক্যাম্পে। এখান থেকে গ্রুপ গ্রুপ করে অস্ত্র-গোলাবারুদসহ বাংলাদেশের ভিতরে আনা হতো। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই পায়ে হেঁটে আসতে হতো। এই ক্যাম্পের প্রধান দায়িত্বে ছিলেন সকলের শ্রদ্ধেয় দাদা ভাই, বাংলাদেশের জাতীয় ছাত্রনেতা জনাব সিরাজুল আলম খান।

শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সিরাজগঞ্জের মঞ্জুরুল হক ভূঁইঞা এই ক্যাম্পে ছিলেন। সার্বক্ষণিক সিরাজুল ইসলাম খানের নির্দেশমত দায়িত্ব পালন করতেন। একপর্যায়ে ভারতীয় লেঃ জেনারেল উবানের সান্নিধ্যে যাওয়ারও সৌভাগ্য হয়েছিল মঞ্জুরুল হক ভূঁইঞার।

কিছু কিছু বিষয় আছে, যা না লিখলে ইতিহাস অসম্পূর্ণ থেকে যায় বলে আমার মনে হচ্ছে। ভারতে গিয়ে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ নিয়ে যারা দেশে এসেছেন তাদের কেউ F.F. কেউ B.L.F. বা কেউ মুজিব বাহিনী বলে কিংবা কেউবা আবার প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধা বলে পরিচিত। কিন্তু যারা ভারতে না গিয়ে দেশের ভেতরেই প্রশিক্ষণ নিয়ে আমাদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধ করে শহিদ হয়েছেন, আহত হয়েছেন অথবা অক্ষত অবস্থায় আজও হয়তো বেঁচে আছেন, তাঁদের

পরিচয় কি? তারা কি মুক্তিযোদ্ধা নয়? এ প্রশ্নের উত্তর কে দেবেন? দুঃখজনক হলো আজও মুক্তিযোদ্ধাদের সত্যিকারের কোন তালিকা হলো না বরং দিনে দিনে আরো মুক্তিযোদ্ধা তৈরি হচ্ছে এ দেশে। অন্যদিকে, অনেক প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধাদেরকে অনেকেই না জেনেই ভুয়া মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে চিহ্নিত করার চেষ্টা চালাচ্ছে।

আমাদের সিরাজগঞ্জের প্রথম ১৩ জনের দলটাকে পাঠানোর ব্যবস্থা হলো দেশের ভিতরে। আমরা সবাই ছিলাম ভারতীয় সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধানে বিশেষভাবে প্রশিক্ষিত গেরিলা-যোদ্ধা। পাঙ্গা ক্যাম্পে আমাদের সিরাজগঞ্জের অনেককেই পেলাম, যাঁরা ছিলেন সকলেই নেতৃস্থানীয় ছাত্রনেতা। তৎকালীন রাকসুর জি. এস. বেড়া থানার আবদুস সামাদ ভাই, মোজাফফর হোসেন মোজাম (বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত মেজর), বিমল কুমার দাস (বর্তমানে সিনিয়র এ্যাডভোকেট), আলহাজ্ব ইসাহাক আলী, ফিরোজ ভূঁইঞা, মঞ্জু ভূঁইঞা, আলহাজ্ব হাবিবুল ইসলাম (হাবিবুল্লা), সিরাজগঞ্জের খোর্দবয়রার আমির হোসেন খান, (তৎকালীন জি. এস. সিরাজগঞ্জ কলেজ ছাত্রসংসদ)। কাজীপুরের শেখ আব্দুল আজিজ এবং আমি, শাহজাদপুরের বাকী মির্জা, উল্লাপাড়ার আজিজ মির্জা, সলপের পান্না (সাবেক চেয়ারম্যান), সিরাজগঞ্জের বর্তমান উপজেলা চেয়ারম্যান গোলাম কিবরিয়াসহ আরও অনেককেই পেলাম। মঞ্জু ভূঁইঞা ও গোলাম কিবরিয়াকে পাঙ্গা ক্যাম্পে রেখে আমরা মোট ১৩ জন সিরাজগঞ্জের উদ্দ্যেশে রওনা হলাম। ২রা আগস্ট রাজশাহীর চেঙ্গিসপুর বর্ডার দিয়ে গভীর রাতে পা রাখলাম দেশের মাটিতে। ভারতীয় সেনাবাহিনীর এক বাঙালী ক্যাপ্টেন আমাদেরকে বিদায় জানালেন। বগুড়ার সারিয়াকান্দির মমতাজ উদ্দিন আমাদের পথ-প্রদর্শক। আমাদের প্রত্যেকের হাতে একটা রাশিয়ান এস. এল. আর. ২৫০ রাউন্ড গুলি, ১২টি করে হ্যান্ড গ্রেনেড, ৬টি করে টি. এন. টি. স্লাব (বিস্ফোরক), পিঠে হ্যাভারসেক, পায়ে জঙ্গল-বুটসহ মোট ৪২ কেজি করে ওজন। সে এক দুঃসাহসিক অভিযান! সারাদেশের গ্রামে-গঞ্জে তখন পাকসেনারা ছড়িয়ে পড়েছে, সাথে আছে এদেশীয় দোসর রাজাকার, আলবদর বাহিনী এবং মুসলিম লীগের দালালরা। মমতাজ ভাই আমাদের সাথে নিয়ে রওনা দিলেন। সারারাত হেঁটে আসার পর শেষ রাত্রির দিকে মমতাজ ভাই কর্তৃক পূর্ব-নির্ধারিত শেল্টারে উঠলাম। সারাদিন আমরা গোপনে চুপচাপ থাকতাম ঐ সব শেল্টারে। গ্রামের লোকেরা আমাদের সযত্নে আপ্যায়ন করতেন। মমতাজ ভাই আমাদেরকে রেখে চলে যেতেন পরবর্তী শেল্টার ঠিক করার জন্য। আবার রাতে এসে আমাদেরকে নিয়ে যেতেন। এভাবে প্রতি রাতেই ১০/১২ মাইল পথ অতিক্রম করে এগিয়ে যাই সিরাজগঞ্জের দিকে। মমতাজ ভাইয়ের অবর্ণনীয় পরিশ্রম ও প্রচেষ্টায় আমরা

১৫ই আগস্ট বগুড়ার চন্দন বাইশা গ্রামে এসে পৌছোলাম। পরদিন ১৬ই আগস্ট দিবাগত রাতে নৌকাযোগে আমরা কাজীপুরের দিকে রওনা দিলাম। আমি কাজীপুরের ছেলে, রাস্তাঘাট সব আমার চেনা, তাই আর কোন গাইডের দরকার হল না। আমরা মমতাজ ভাইয়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যমুনায় নৌকা ভাসালাম। সারিয়াকান্দির এই মমতাজ ভাইয়ের বাড়ি ঠিক কোন্ গ্রামে তা আমার জানা নেই, তবে এই অকুতোভয় সৈনিকের সে অবদানের কথা সিরাজগঞ্জে তথা উত্তরবঙ্গের অনেক মুক্তিযোদ্ধার মনে গাঁথা আছে। এই মমতাজ ভাইকে আমরা কখনও ঘুমাতে দেখি নি। দিনরাত তাঁকে হাঁটতে হতো। মমতাজ ভাইকে ছাড়া সিরাজগঞ্জের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস লেখা হবে না। কারণ তিনি যাঁদেরকে পথ দেখিয়ে নিয়ে এসেছিলেন, তাঁরা প্রত্যেকেই নেতৃস্থানীয় মুক্তিযোদ্ধা এবং পরবর্তীতে তাঁদেরই নেতৃত্বে গড়ে ওঠে বিভিন্ন মুক্তিযোদ্ধার দল। ঐসব বাহিনীর বীরত্বের ফসলই আজকের স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ। সে মমতাজ ভাই আজ আর নেই! কারণ পাকসেনাদের হাতে তিনি গ্রেপ্তার হন। অমানবিক অত্যাচার করে প্রথমে তাঁর চোখ দুটো তুলে নেয়া হয় এবং বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে-খুঁচিয়ে তাঁকে হত্যা করেছিল। (ইন্না... রাজেউন)

আল্লার কাছে তাঁর রূহের মাগফেরাত কামনা করছি।

আমরা যমুনার উত্তাল ঢেউ পাড়ি দিয়ে ভাটির দিকে চলছি। আকাশে বৃষ্টি হচ্ছে। মুষলধারে বৃষ্টি ছিল আমাদের পরম বন্ধু এবং সহায়ক শক্তি। আল্লার ইচ্ছায় সে বছর পুরো আগস্ট মাসেই প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়েছিল, যা আমাদেরকে নিরাপদে পথ চলতে সাহায্য করেছিল। ১৬ই আগস্ট রাতেও ছিল বৃষ্টি, তবে হালকা। আমরা চলেছি কাজীপুরের দিকে। পথিমধ্যে শুনেছি কাজীপুর থানা হেডকোয়ার্টারে আর্মি আছে। যমুনার পাড়েই থানা হেড কোয়ার্টার। ঘুটঘুটে অন্ধকার। বৃষ্টির ঝপঝপানি শব্দ ছাড়া আর কিছু শোনা যায় না। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকানি। সেই আলোতে কিছুটা দেখা যায়। চোখে পড়ল নদীর পাড়ের রাস্তাটায় একটি বড় আকারের আর্মি কনভয়ের মত একটা কিছু। নৌকা ভিড়ালাম কিনারায়। অতি সন্তর্পণে আমি, ইসাহাক ভাই ও ফিরোজ ভূঁইএগ নেমে পড়লাম পাড়ে। আস্তে আস্তে এগোতে থাকলাম ঐ আবছা আবছা কালো বস্তুটার দিকে। হঠাৎ কপাল ঠেকলো ইটের দেয়ালের সাথে। বিজলীর চমকানিতে দেখতে পেলাম ওটা কোন গাড়ী নয়। কাজীপুর থানা বিল্ডিং-এর পশ্চিম পাশের সদ্য নির্মিত সি.ও.-র ডাকবাংলা। ভ্রম কেটে গেল। আমরা একদম সেনা ক্যাম্পের কাছে এসে পড়েছি। তাড়াতাড়ি পিছিয়ে গিয়ে নৌকায় চাপলাম। নৌকা ঘুরিয়ে পূর্ব দিকে আবার যমুনায় গা ভাসালাম। গভীর রাতে কাজীপুর থানা থেকে প্রায় ৪ মাইল দক্ষিণে আমার নিজ বাড়ি দোয়েল গ্রামে

গেলাম। বাড়ির পিছনের বাঁশঝাড়ের ভিতর দিয়ে চুপি-চুপি নৌকা ভিড়ালাম। আমি নামলাম। বাড়ির ভিতরে গিয়ে দেখি একটি ঘর ছাড়া আর সব ঘরের দরজা খোলা। ঘরের ভিতরে কেউ নেই। আমার বড় চাচার ঘরের দরজায় আঘাত করলে ভিতর থেকে চাচা জবাব দিলেন। দরজা খুলে আমাকে দেখে বুকে জড়িয়ে ধরে হাউমাউ করে কান্না শুরু করলেন। বাড়িতে খবর ছিল আমি বেঁচে নেই। পাশেই ছিল মুসলিম লীগের এক দালাল আলহাজ্ব সোহরাব হোসেনের বাড়ি। তারই অত্যাচারে বাড়িছাড়া হয়েছিল আমার মা-বাবা, দাদা-দাদী সবাই। আমরা খুব সাবধানে একটা ঘরে অবস্থান নিলাম। নিরাপত্তার কথা ভেবেই ঘরের এক কোণায় মাটি খুঁড়ে পায়খানার ব্যবস্থা করেছিলেন চাচা। সারাদিন ঘরের ভিতরে থেকে রাতে বাড়ি ছাড়লাম। এলাম বাসখালায় আমার ভগ্নিপতি হাবিবুর রহমানের (কালু) বাড়ি, পরদিন রাতে আমরা যার যার দায়িত্ব ভাগ করে নিয়ে সিরাজগঞ্জের বিভিন্ন থানায় ছড়িয়ে পড়লাম। আমার মনে আছে আমি পাঙ্গাসি পর্যন্ত পানির ভিতর দিয়ে হেঁটে হেঁটে গিয়েছিলাম আজিজ মির্জা, বিমল, পান্না ও বাকী মির্জাদের পৌঁছে দিতে। ১৮ই আগস্ট আমরা আলাদা হয়ে গেলাম। আমি ও শেখ আজিজ রয়ে গেলাম কাজীপুরে। শেখ আজিজকে ওর নিজ গ্রাম রেহাইসুরীবেড়ের চরে পাঠিয়ে দিয়ে আমি রয়ে গেলাম থানার দক্ষিণ অংশে। আমাদের দায়িত্ব ছিল স্থানীয় যুবকদের সংগ্রহ করে প্রশিক্ষণ দিয়ে জনসাধারণকে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত করা। আমি আজিতপুর চরের ঘন কাশবনের মাঝে একটা জায়গা ঠিক করলাম। প্রতিরাতে আশেপাশের গ্রাম থেকে যুবকেরা আসতো নৌকা যোগে। তাদেরকে প্রশিক্ষণ দিয়ে গড়ে তুললাম শতাধিক মুক্তিযোদ্ধার দল। এবার দরকার অস্ত্রের। আমি চলে গেলাম ভারতের পাঙ্গা ক্যাম্পে। কিন্তু পাঙ্গাক্যাম্প থেকে ফিরে আসলাম খালি হাতে। বলা হল, অস্ত্র পৌঁছে যাবে আমার কাছে। ফেরার পথে মাইনকাচরে এসে জানলাম রৌমারীতে ক্যাম্প স্থাপন করা হয়েছে এবং সেখানে সিরাজগঞ্জের সব মুক্তিযোদ্ধারা আছে। আমি রৌমারীতে গিয়ে জহিরুল ইসলাম মিন্টু, আবদুর রউফ পাতা, গোলাম হায়দার খোকা এবং রফিকুলসহ আরও অনেককেই পেলাম। রৌমারী ক্যাম্পে রফিকুলের কাছে শুনলাম ওর গ্রেফতার হওয়ার কাহিনী এবং পরবর্তীতে এক বেলুচ সেনা সদস্যের সহযোগিতায় ওর পালিয়ে আসার সেই মর্মান্তিক কাহিনীর কথা। সে এক দুঃসাহসিক অভিযান ছাড়া আর কি বলা যায়!

আমরা ১৬ই আগস্ট দেশে এসে জানতে পারলাম, এরই মাঝে আমির হোসেন ভুলু রৌমারী ক্যাম্প থেকে একদল মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে সিরাজগঞ্জে এসেছেন। সেপ্টেম্বর মাসের প্রথমদিকেই কাজীপুর থানা আক্রমণ করে পিছিয়ে যায়। এই দলটি ১৭ই সেপ্টেম্বর দিবাগত রাতে সোহাগপুর এবং বেলকুচি থানা আক্রমণ

করে। ১৭ই সেপ্টেম্বর বেলকুচির যুদ্ধে কাজীপুরের আবদুর রশীদ এবং উল্লাপাড়ার শামসুল হক আহত হন। পরদিন ১৮ই সেপ্টেম্বর আহত রশীদকে নিয়ে আমির হোসেন ভুলু তার দলবল নিয়ে কাজীপুরে আসেন নৌকাযোগে। বড়বাড়িয়া চরের কাছে আমার সাথে দেখা হয়। আমি তখন আজিতপুর কাঁশবনের মাঝে অস্থায়ী প্রশিক্ষণ ক্যাম্প স্থাপন করে স্থানীয় যুবকদের রাতে রাতে প্রশিক্ষণ দিয়ে প্রায় ১১০ জনকে প্রস্তুত করেছি। আমির হোসেন ভুলুর সাথে দেখা হওয়ার পর তিনি তাঁর সাথের প্রায় ৪০/৪৫ জন ভারতে প্রশিক্ষিত এফ. এফ. মুক্তিযোদ্ধাকে আমার হাতে তুলে দেন। আমাকে (চর বন্দী) আজমল হক (মরহুম) রেজাউল চৌধুরী, আমির হোসেন সরকার, গোলাম (তারাকান্দি) ডাক্তারসহ রুহুল আমিন এবং আরও অনেকের উপস্থিতিতে আলোচনার মাধ্যমে তাঁর দলের অধিনায়ক নিযুক্ত করা হলো। মুক্তিযোদ্ধাকে আমার হাতে বুঝিয়ে দিয়ে আহত রশীদকে নিয়ে ভারতের উদ্দেশ্যে রওনা হন রাতে। আমার দল গঠিত হল সেইদিনই। আমি ছিলাম বি.এল.এফ-এর সদস্য মুক্তিযোদ্ধা, মূলত মোজাফ্‌ফর হোসেন মোজামের সহযোগী। কথা ছিল মোজাম বাহিনীতে যোগ দেয়ার। কিন্তু অযাচিৎভাবে ঘটে যাওয়া এক দুর্ঘটনার কারণে আর মোজাম বাহিনীতে ফিরে যাওয়া হয়নি। গড়ে তুললাম আলাদা বাহিনী। ১৮ই সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় আমার দলের সদস্য চিলগাছার রফিকুল আমার কাছ থেকে কয়েক ঘণ্টার ছুটি নিয়ে গিয়েছিল চিলগাছায় ওর বাড়িতে মায়ের সাথে দেখা করতে। ঐ গ্রামে আশ্রয় নিয়েছিল মোজাফফর বাহিনী। রফিকুল ঐ খবর শুনে মোজাম ভাইদের সাথে দেখা করার জন্য যায়। দুর্ভাগ্যবশতঃ ভুল তথ্যের ভিত্তিতে মোজামভাই রফিকুলের প্রতি ছিল চরমভাবে বিদ্বেষী। রফিকুল যাওয়ার পর ওর কাছ থেকে রিভলভার নিয়ে তাই দিয়ে ওকে গুলি করে। রফিকুলের অপরাধ ছিল অস্ত্র বিক্রির, যা আমরা গচ্ছিত রেখে ভারতে গিয়েছিলাম। রাত ৩ টায় রফিকুলের বড় ভাই মরহুম ডা. নূরুল ইসলাম আমার কাছে ঐ দুঃসংবাদ নিয়ে এল। খবর পাওয়ার সাথে সাথে পুরো বাহিনী উত্তেজিত হয়ে মোজামভাইকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে নৌকা থেকে রাস্তায় নেমে পড়ল। যেহেতু আমি মোজামের দলের সদস্য তাই আমাকেও তারা সন্দেহের তালিকায় রাখল। ভাগ্যক্রমে ঐ দলের বেশীর ভাগ সদস্যই ছিল আমার নিজ এলাকার এবং আমার খুবই কাছের লোক। অনেক বুঝিয়ে ওদের শান্ত করে রফিকুলকে জীবিত অথবা মৃত অবস্থায় নিয়ে আসার জন্য ৩৫ জনের একটি সশস্ত্র দলকে পাঠালাম। রফিকুলকে সাথে নিয়ে ১৯শে মে সকাল ৭-৮টার দিকে আমার কাছে এল যমুনায়। তারাকান্দির গোলাপ ভাইকে দিয়ে প্রাথমিক চিকিৎসা করে একটি নৌকা নিয়ে ভারতের দিকে রওনা দিলাম। জজিরা চরের কাছে গিয়ে আমির হোসেন ভুলুকে পেয়ে তার সাথেই

গোলাপ ভাইসহ রফিকুলকে পাঠিয়ে দিয়ে আমি ফিরে এলাম আমার বাহিনীতে। রফিকুলের সাথে আমার কথা হয়। কথা বলতে বলতেই ও ঘুমিয়ে পড়ে। আমার আজও মনে পড়ে রফিকুলের সেই শেষ কথা 'দোস্ত তুই বিশ্বাস কর, আমি কোন রাইফেল বিক্রি করি নি। আমাকে অন্যায়ভাবে মেরে ফেললো ওরা।' যা হোক সে বিষাদের কথা আর বলতে চাই না। রফিকুল ভারতে যাওয়ার পথে বিকাল পাঁচটায় ইন্তেকাল করে (ইন্না... রাজেউন)। ফিরে এল রফিকুলের লাশ। ভোরে তারাকান্দির নদীর পাড়ে নামাজে জানাজা করে ওকে পাঠালাম ওর বাড়িতে। দুপুরেই ওকে সমাধিস্থ করা হয়। রফিকুলের কবর তৈরি করার কাজটি করেন আমার নিজ গ্রামের আবুল হোসেন মুন্সী। আজ রফিকুল নেই কিন্তু ওর ঐ শেষ বাণী 'দোস্ত তুই বিশ্বাস কর আমি কোন রাইফেল বিক্রি করি নি' আজও আমাকে কুঁড়ে-কুঁড়ে খাচ্ছে। আল্লার কাছে ওর বেহেস্ত নসিফ কামনা করি আমি।

এ ঘটনার পর আমার আর মোজাম·বাহিনীতে ফিরে যাওয়া হয়নি। চরম এক বিপর্যয় ঠেকাতে আমাকে গড়ে তুলতে হয়েছিল নিজস্ব বাহিনী।

মোজাম ভাইয়ের সাথে গোপনে মহিষামুড়াতে দেখা করে কিছুদিনের জন্য একটু দূরে থাকার পরামর্শ দিয়ে আসলাম।

সিরাজগঞ্জে তখন মোটামুটি তিনটি বাহিনী। একটি মোজাম বাহিনী, একটি আমার নিজের বাহিনী এবং অন্যটি লতিফ মির্জার পলাশডাঙা যুবশিবির। পলাশডাঙার যুবশিবিরের আছে এক ঐতিহ্যবাহী গৌরবময় ইতিহাস।



চান্দু শেখের বাড়ি, পলাশ ডাঙা যুবশিবির গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এই বাড়িতে

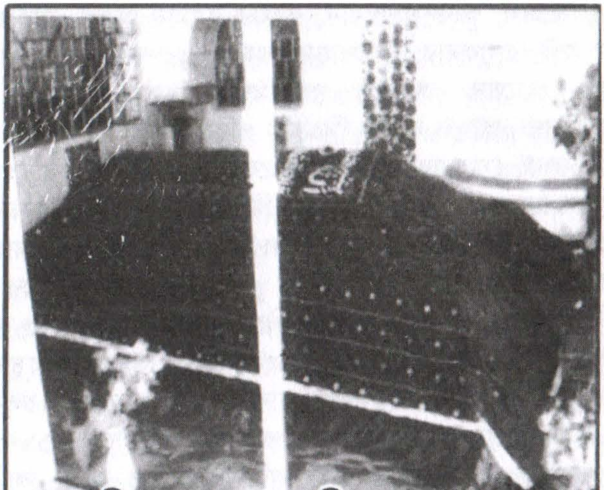
পলাশডাঙা যুবশিবির

২৫শে এপ্রিল সিরাজগঞ্জে শত্রুসেনা প্রবেশের পর আমরা যখন ভারতে যাই প্রশিক্ষণের জন্য তখন মাত্র ৫ জন যুবক অদম্য সাহসী ভূমিকা নিয়ে

কামারখন্দ উপজেলার ভদ্রঘাটের জাঙ্গিলাগাতি গ্রামের চান্দু শেখের বাড়িতে অবস্থান নেয়। বর্তমানের সিরাজগঞ্জ ইউনিট কমান্ডার সোহরাব আলী সরকারসহ আরও ৪ জন। ঐ বাড়িটি সোহরাব আলীর নানা ওসিম উদ্দিন শেখের বাড়ি। চান্দু শেখ তারই ছেলে। ঐ বাড়িতেই প্রতিষ্ঠিত করেন পলাশ ডাঙা যুবশিবির। (১) সোহরাব আলী সরকার (২) আবদুল আজিজ সরকার বর্তমানে অধ্যক্ষ (চৌধুরী সালাম জাহাঙ্গীর কলেজ) (৩) মনিরুল ইসলাম, (৪) লুৎফর রহমান মাখন এবং (৫) শফিকুল ইসলাম শফি। তাদের হাতে ছিল সিরাজগঞ্জ থেকে নিয়ে যাওয়া কিছু অস্ত্রসস্ত্র। ভদ্রঘাট এলাকাটি ছিল যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন এলাকা। এলাকার মানুষগুলো অর্থনৈতিকভাবে খুবই দুর্বল ছিল। অনাহারে, অর্ধাহারে তাদের জীবন কাটতো। খাল-বিল, নদীবেষ্টিত এলাকা। আস্তে আস্তে এলাকার যুবকেরা যোগ দেয় তাদের সাথে। ইতোমধ্যে কালিবাড়ী ভদ্রঘাটের পাশের গ্রামে একদল ডাকাত হানা দেয়। ডাকাতের মোকাবিলায় ঝাঁপিয়ে পড়ে ছাত্ররা। প্রচণ্ড গোলাগুলির পর ডাকাতরা সারেণ্ডার করে। স্বস্তি ফিরে আসে এলাকার মানুষের মাঝে। এলাকার মানুষের সমর্থনপুষ্ট হয় ছাত্ররা। এই ছাত্ররাই পরবর্তীতে প্রতিষ্ঠা করে পলাশডাঙা যুবশিবির। ইতোমধ্যে আমাদেরকে ভারতের জলপাইগুঁড়ি জেলার পাঙ্গা ক্যাম্পে পৌঁছে দিয়ে লতিফ মির্জা চলে আসেন সিরাজগঞ্জে। তিনি আর ভারতে না গিয়ে যোগ দেন এই শিবিরে। এই শিবিরের পক্ষ থেকে প্রথম যুদ্ধ হয় হরিপুর এলাকায়। অংশগ্রহণ করে মাত্র পাঁচজন মুক্তিযোদ্ধা, যথাক্রমে সোহরাব আলী সরকার, আবদুল আজিজ সরকার, লুৎফর রহমান মাখন, শফিকুল ইসলাম শফি ও মোহাম্মাদ আলী বাঘা। জুন মাসের প্রথম দিকে লতিফ মির্জা এই শিবিরে যোগ দেন। এলোমেলো অবস্থানে না থেকে সুসংগঠিত হওয়ার প্রয়োজন অনুভব করেন মুক্তিযোদ্ধারা। পলাশীর যুদ্ধের কথা স্মরণ করে পলাশীর "পলাশ" এবং জাঙ্গিলাগাতি তথা ভদ্রঘাট এলাকার ডাঙার 'ডাঙা' শব্দ দুটি একত্রে করে "পলাশ ডাঙা" "যুবশিবির" নামের প্রস্তাব করেন আবদুল আজিজ সরকার এবং উপস্থিত সকলে একমত হয়ে এই পলাশডাঙা যুবশিবির নামটি নামকরণ করেন। দলে-দলে বিভিন্ন এলাকার যুবকেরা যোগ দিতে থাকে শিবিরে। জাঙ্গিলা গাতির চান্দুর বাড়ির এই শিবির ছড়িয়ে পড়ে বসাক পাড়া, কুঠিবাড়ী, কঠিনচর, ভদ্রঘাট, নানদিনাহাট, সৈয়দগাতি, মুগবেলাই, ঘাটি বেলাইসহ এলাকার বিভিন্ন গ্রামে। পরবর্তীতে বাড়ি ছেড়ে নৌকায় অবস্থান নেয় শিবিরযোদ্ধারা। চলনবিল এলাকার বিশাল জলরাশির বুকে ভসে বেড়ায় পলাশডাঙা যুবশিবিরের শতাধিক নৌকা আরোহী মুক্তিযোদ্ধারা। এরই মাঝে ভারতে প্রশিক্ষণের পর অনেক মুক্তিযোদ্ধা এসে যোগ দেয় পলাশডাঙা যুদ্ধশিবিরে। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য তৎকালীন

বাকসুর জি.এস. আবদুস সামাদ, লুৎফর রহমান অরুণ, বিমল কুমার দাস, আবদুল হাই তালুকদার, উল্লাপাড়ার সামাদ, খুরশিদ আলম, শামসুল আলম, মাজাহার হোসেন, আবদুল বাকীমির্জাসহ আরও অনেক নেতৃস্থানীয় মুক্তিযোদ্ধাগণ। আব্দুল লতিফ মির্জাকে পরিচালক, আব্দুস সামাদ ও বিমলকে সহ-পরিচালক, সোহরাব আলী সরকারকে সি.এন.সি. লুৎফর রহমান অরুণকে ব্যাটালিয়ন কমান্ডার, আবদুল আজিজ মির্জাকে সাংগঠনিক পরিচালক, আবদুল হাই তালুকদারকে কোষাধ্যক্ষ, আবদুল আজিজ সরকার ও মোসাদ্দেক আলী সাকুকে খাদ্যসংগ্রহের দায়িত্ব দিয়ে পলাশডাঙা যুবশিবিরের নতুন যাত্রা সংযোজিত হয়। পলাশডাঙা যুবশিবিরে যোগ দিতে থাকে ভারত থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অনেক মুক্তিযোদ্ধা এবং দেশের ভিতরে অবস্থানরত অনেক সামরিক বাহিনীর সদস্যসহ পুলিশ, আনসার এবং যুবকেরা। চলনবিলের বুকে ভেসে ভেসে উত্তরে সোনামুখী পর্যন্ত তাদের বিস্তৃতি ছিল। ১৯৭১ সনের জুন থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত এই বাহিনী কৈডাঙা ব্রিজ, কালিয়া হরিপুর রেলব্রিজের সম্মুখ যুদ্ধ, সলঙ্গা ক্যাম্পে আক্রমণ, লাহিড়ী মোহনপুরের যুদ্ধ, কৈজুরী অপারেশনসহ অনেক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। সবশেষে এল ১০ই নভেম্বর। বিখ্যাত তারাশ থানা আক্রমণ, ব্রহ্মগাছার যুদ্ধ, ও নওগাঁ হাটের আশে-পাশে অবস্থানরত অবস্থায় পাকবাহিনী আক্রমণ করে পলাশডাঙা যুবশিবিরকে। স্মরণকালের এই যুদ্ধে অলৌকিকভাবে পরাজিত হয় পাকসেনারা। শতাধিক পাকসেনা নিহত হয়। অন্যদিকে একজন মুক্তিযোদ্ধাও আহত বা নিহত হয়নি। নওগাঁ হাট থেকে প্রায় ২ কিলোমিটার পূর্বে অবস্থিত হযরত হাজী গাজী শরিফ শাহ জিন্দানী (রহঃ)-এর মাজার। এই দুই কিলোমিটার জুড়ে যুদ্ধের বিস্তৃতি ছিল।

শীতের কুয়াশাচ্ছন্ন ভোরে এই যুদ্ধ শুরু হয়। যুদ্ধের জায়গা আমি নিজে সরেজমিনে পরিদর্শন করতে করতে স্থানীয় প্রবীণ লোকদের কাছে জানতে পারি কিছু অলৌকিক ঘটনার কথা। পাকসেনারা সাংঘাতিক বেয়াদবী করেছিল মাজারে শায়িত আল্লাহর অলির সাথে। পরবর্তীতে মুক্তিযোদ্ধাদের ছোঁড়া গুলির সামনে টিকতে না পেরে পালাতে থাকে এলোপাতাড়ি। পানিতে নেমে নিম্নজলরাশি পাড়ি দেয়ার চেষ্টা করে। মুক্তিযোদ্ধারা পানিতে নেমে ওদের ডুবিয়ে মারে। পাড়ে দাঁড়িয়ে থাকা সাধারণ মানুষ মাছ মারার জুইতা (স্থানীয় নাম ট্যাটা) দিয়ে আষাঢ়ে বোয়াল মাছের মত ওদেরকে গেঁথে ফেলে। ডাঙার পারে উঠে আসা সৈনিকদেরকে মেয়েরাও বটি দা, রামদা দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করে। এই ঐতিহাসিক যুদ্ধের কথা চিরস্মরণীয়-বরণীয় হয়ে আছে এলাকাবাসীর মনে। সিরাজগঞ্জের মুক্তিযুদ্ধে নওগাঁর এই যুদ্ধই পলাশডাঙা যুবশিবিরের শেষ যুদ্ধ।



দাদা পীরের রওজা শরীফ

হযরত খাজা মঈনউদ্দিন চিশতী (র:) এর দাদা পীর
হযরত হাজী গাজী শাহ্‌শরীফ জিন্দানী (রঃ)
তাড়াশ নওগাঁ, জেলাঃ সিরাজগঞ্জ।

এখানে ১৯৭১ সনে ১১ নভেম্বর মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে পাকহানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে উত্তর বঙ্গের সর্ব বৃহত্তম যুদ্ধ সংগঠিত হয়। যুদ্ধে পাকহানাদার বাহিনীর ০২(দুই) কোম্পানী সৈন্য ধ্বংস হয় এবং পাক ক্যাপ্টেন সেলিম সহ ১৪ জন হানাদার বাহিনী ধৃত হয় কিন্তু দাদাপীরের দোয়ায় কোন মুক্তিযোদ্ধা এবং জনগণের কোন প্রকার ক্ষতি হয়নি। এই ঐতিহাসিক যুদ্ধে নেতৃত্ব দান করেন গাজী লুৎফর রহমান অরুন,গাজী সোহরাব আলী সরকার ও জনাব আব্দুল লতিফ মির্জা।

সৌজন্যেঃ গাজী লুৎফর রহমান অরুন

মোজাফ্‌ফর বাহিনী

আগেই উল্লেখ করেছি মোজাফ্‌ফর বাহিনীর কথা। ভারত থেকে BLF-এ প্রশিক্ষণ নিয়ে আমরা একসাথে সিরাজগঞ্জে । মোজাফ্‌ফর হোসেনসহ আমরা সবাই পৃথক-পৃথকভাবে স্থানীয় যুবকদের সংগ্রহ করে গোপনে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করি। রহমতগঞ্জের ইসমাঈল ফরিদসহ আরও বেশকিছু মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে মোজাম বাহিনী গঠিত হয়। ডাঙায় এ গ্রাম থেকে সে গ্রামে বিভিন্ন স্থানে শেল্টার নিয়ে অবস্থান করতে থাকে। অক্টোবর মাসের শেষ দিকে রমজানের প্রথমদিকে ভাটপিয়ারীতে অবস্থিত রাজাকার ক্যাম্প থেকে স্থানীয় জনসাধারণের উপর অত্যাচার জুলুম চলত। হত্যা, লুটতরাজ, নারীধর্ষণ, অগ্নিসংযোগসহ বিভিন্ন অপকর্মে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল এলাকার জনগণ।

মোজাম বাহিনী ভোর রাত্রে ঐ ক্যাম্প আক্রমণ করে। আক্রমণে তছনছ হয়ে যায় রাজাকার ক্যাম্প। নিহত হয় বেশ কয়েকজন রাজাকার। এই যুদ্ধে আমিনুল ইসলাম চৌধুরী আহত হয়। প্রথম বিজয় অর্জন হয় মোজাম বাহিনীর। এরপর মোজাম বাহিনী অক্টোবর মাসেই ব্রহ্মগাছা যুদ্ধে পাকসেনাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। ব্রহ্মগাছার ঐ যুদ্ধের পলাশডাঙা যুবশিবিরের সাথেই মূলযুদ্ধ সংঘঠিত হয়। মুক্তিযোদ্ধাদের প্রচণ্ড আক্রমণের চাপে পাকবাহিনী পিছু হটতে বাধ্য হয়। ১০/১১ জন রাজাকার বন্দি হয় পলাশডাঙা বাহিনীর হাতে এবং তাদের সবকটাকেই হত্যা করা হয়। অর্জিত হয় বেশ কিছু অস্ত্রসস্ত্র। তারপর মোজাম-বাহিনী এখানে-সেখানে অবস্থান নেয়ার এক পর্যায়ে ১৩ই নভেম্বর বরইতলা গ্রামে শেল্টার নেয়। স্থানীয় রাজাকার-আলবদরদের ষড়যন্ত্রে কাজীপুর থেকে কয়েকশ' পাকসেনা ১৪ই নভেম্বর ভোর রাতে বরইতলায় মোজামবাহিনীকে আক্রমণ করে। হঠাৎ আক্রমণের মুখে মোজাম-বাহিনী সম্মুখ-যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। কিন্তু অত্যাধুনিক অস্ত্রসস্ত্রে সজ্জিত পাকবাহিনীর তীব্র আক্রমণের মুখে মোজাম-বাহিনী পিছু হটতে বাধ্য হয়। পাকবাহিনী বরইতলাগ্রামে ঢুকে একের পর এক হত্যা করতে থাকে গ্রামবাসীকে, অগ্নিসংযোগ করে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে শেষ করে দেয় বরইতলাকে। মোজাম-বাহিনীর এটাই শেষ যুদ্ধ।

বরইতলার যুদ্ধ

এবার আসি আমার নিজের কথায়। আগেই বলেছি, ইতিহাসের এক নির্মম অধ্যায়ের কথা। অযাচিত দুর্ঘটনার কবলে পড়ে রফিকুল নিহত হবার পর আমার নিজের বাহিনী গড়ে ওঠে। অক্টোবর মাসের ১৭ তারিখ কাজীপুর থানা রাজাকার কমাণ্ডার মনসের (ডাকাত রাজাকার কমান্ডার) হত্যার পর রাতেই আমরা ক্ষুদ বান্দির দক্ষিণে সিংরাবাড়ীর পশ্চিম-পাশে আখের ক্ষেতের ভিতর পজিশন নিয়ে অপেক্ষা করছিলাম। নদীর পশ্চিম-পাশ দিয়ে ছিল জেলা পরিষদের সড়ক। আমরা নিশ্চিত ছিলাম যে, কাজীপুর থেকে পাকবাহিনী আসবে মনসরের মরদেহ সৎকারের জন্য। অপেক্ষার পালা শেষ করে এলো আর্মির পরিবর্তে ১৭/১৮ জনের এক রাজাকারবাহিনী। তারা সড়ক দিয়ে না এসে ইছামতি নদীর পূর্ব-পাড়ের রাস্তা দিয়ে আসছিল। আমাদের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল। আমরা আখের ক্ষেত থেকে বাইরে এসে গুলি চালালাম নদীর পশ্চিম-পাড় থেকে। নদীটাকে একটা বড় খাল বললেই যুক্তিযুক্ত হবে। গুলি চালাতে চালাতে আমরা নদীর পানিতে নেমে পূর্ব-পাড়ে এসেছিলাম। হঠাৎ আক্রমণের শিকার হয়ে রাজাকাররা হাতের অস্ত্র ফেলে দেয়। ৬ জন নিহত

হয়, ২ জন আহত হয়। বাকিরা আত্মসমর্পণ করে। আমাদের হাতে আসে ১৮ টা রাইফেল। এটাই আমাদের প্রথম অপারেশন। এলাকার মানুষের মধ্যে তখন কিছুটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফিরে এল। আমরা কখনও নৌকায় যমুনার চর অঞ্চলে, আবার কখনও ডাঙায় বিভিন্ন গ্রামে অবস্থান করছিলাম। এরই মাঝে রৌমারী প্রশিক্ষণ ক্যাম্প থেকে আরও বেশকিছু প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা অস্ত্রসহ এসেছিল আমাদের সাথে। স্থানীয়ভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাসহ ১৬০ জনেরও বেশি মুক্তিযোদ্ধা হল আমার বাহিনীতে। এল ১৩ই নভেম্বর, আমরা সেদিন বরইতলা থেকে প্রায় ৪ মাইল দক্ষিণে খোর্দা-বয়রা ও ভেল্লাবাড়ী গ্রামে শেল্টার নিয়েছিলাম। ১৪ই নভেম্বর ভোরে খবর পেলাম বরইতলার নির্মম ঘটনার কথা। জানতে পারলাম, মোজাফ্ফর বাহিনীকে ঘেরাও করেছে পাকসেনারা। পুরো বরইতলা তখন জ্বলছে। শতশত নারীপুরুষ দৌড়াচ্ছে দক্ষিণ দিকে। ভয়ে জড়সড় মানুষ, কাউকেই থামানো যাচ্ছে না। এরই মাঝে আমরা সিরাজগঞ্জ সোনামুখী সড়কে (বর্তমানে মনসুর আলী সড়কে) দাঁড়িয়েছি। উত্তর দিকে বরইতলার অগ্নিশিখা দেখা যাচ্ছে। কাল বিলম্ব না করে আমরা দৌড় দিলাম বরইতলার দিকে। পথিমধ্যে কাইলকারপুর হাটের উপর আমরা পেলাম বাহুকার জয়নালকে, মোজাম ভাইয়ের বাহিনীর লোক। আমরা সবাই ওকে জয়নাল এ্যামবুশ বলে ডাকতাম। জয়নালের কাছে জানতে পারলাম, মোজাম-বাহিনী ভোর রাতেই পিছু হটে এসেছে। আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম, বরইতলায় পাকবাহিনীকে আক্রমণ করবো। আমার বাহিনীকে ৪ ভাগে ভাগ করলাম, বাওই খোলার মরহুম সোহরাবের নেতৃত্বে প্রথম গ্রুপ বরইতলার পূর্ব দিকে, আমার বাহিনীর Second in command আবদুস সাত্তার চাকলাদারের নেতৃত্বে, বরইতলার দক্ষিণ দিকে সহকমান্ডার আবু সাঈদের নেতৃত্বে, তৃতীয় গ্রুপ বরইতলার পশ্চিম-উত্তরে এবং আমি নিজে চতুর্থ গ্রুপে নেতৃত্ব নিয়ে বরইতলার উত্তরে মাথাইল চাপড়ের দক্ষিণ অংশে অবস্থান নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম।

মাথাইল চাপড় হাট হয়ে উত্তরে কবিহারের ভিতর দিয়ে কাজীপুর সোনামুখী সড়ক থেকে রাস্তা দক্ষিণে বরইতলা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। মাথাইলচাপড় থেকে বরইতলা পর্যন্ত ২ কিলোমিটারের বেশি দূরত্ব ছিল। রাস্তার পূর্ব-পাশে ধারাবাইশার বিল। বিলের উত্তরে আলমপুর, পূর্বে খামার পাড়া এবং বানিয়াজান, দক্ষিণে বরইতলা পশ্চিমে রাস্তার পশ্চিম-পাশে মাথাইল চাপড়, মিরার পাড়া বা বরইতলা নয়াপাড়া গ্রাম। মাঝখানের এই বিশাল জলাভূমিতে ছিল পানি এবং আমন ধানের ক্ষেত। এই রাস্তা ছিল শুকনা। পাক-আর্মিরা এই রাস্তায় মাথাইল চাপড় থেকে বরই তলা পর্যন্ত অবস্থান নিয়েছিল। একদল সেনা বরইতলা গ্রামে ঢুকে পড়ে এবং হত্যাযজ্ঞ শুরু করে। বাকীদের অবস্থান

ছিল ঐ রাস্তা বরাবর। আমরা মুক্তিযোদ্ধারা খামার পাড়ার পশ্চিম-পাশ থেকে বরইতলাসহ পাকসেনাদের ঘিরে ফেলি। বরইতলা পূর্ব-পাড়ার সামনে শুরু হয় প্রচণ্ড যুদ্ধ। বরইতলার দক্ষিণের গ্রুপ এবং উত্তর-পশ্চিম পার্শ্বের আবু সাঈদের গ্রুপের সাথেও প্রচণ্ড যুদ্ধ শুরু হল। কাকতালীয়ভাবে পশ্চিমের কুলকনিয়ায় অবস্থানরত শামসুল হকের গ্রুপের ৩০/৩৫ জন মুক্তিযোদ্ধা যোগ দিল সাঈদের গ্রুপের সাথে। যুদ্ধের নতুন মাত্রা যোগ হলো। আক্রমণের তীব্রতায় পাকসেনারা দিশেহারা হয়ে পড়ে। মাথাইল চাপড়ের দক্ষিণ-পাশের রাস্তার ২০০ গজ পশ্চিম দিকে উত্তর-দক্ষিণে লম্বা একটা খাল ছিল। খালের পূর্ব-পাড় দিয়ে ছিল লম্বা বনের বাতা। আমরা ঐ খালের ঢালু দিয়ে দক্ষিণে অগ্রসর হলাম। কিছু দূর যাওয়ার পর দেখলাম পাক-আর্মির আর্টিলারী গ্রুপ ঐ সড়কে পজিশন নিয়ে বসে আছে। সাথে আছে একদল মুসল্লি। ঐ মুসল্লিরা সবাই ছিল বরইতলার মসজিদে এহতেকাপে। পবিত্র রমজানের এই বরকতময় সময়ে তাদের মসজিদ থেকে ধরে নিয়ে গরুর মত রশি দিয়ে বেঁধে নিয়ে ঐ রাস্তায় দাঁড় করিয়ে রেখেছিল। ঐ মুসল্লিদের দলে ছিল ২৭ জন ধর্মপ্রাণ মানুষ। তাদের নিরাপত্তার কথা ভেবে আমরা আক্রমণ করতে দেরী করছিলাম।

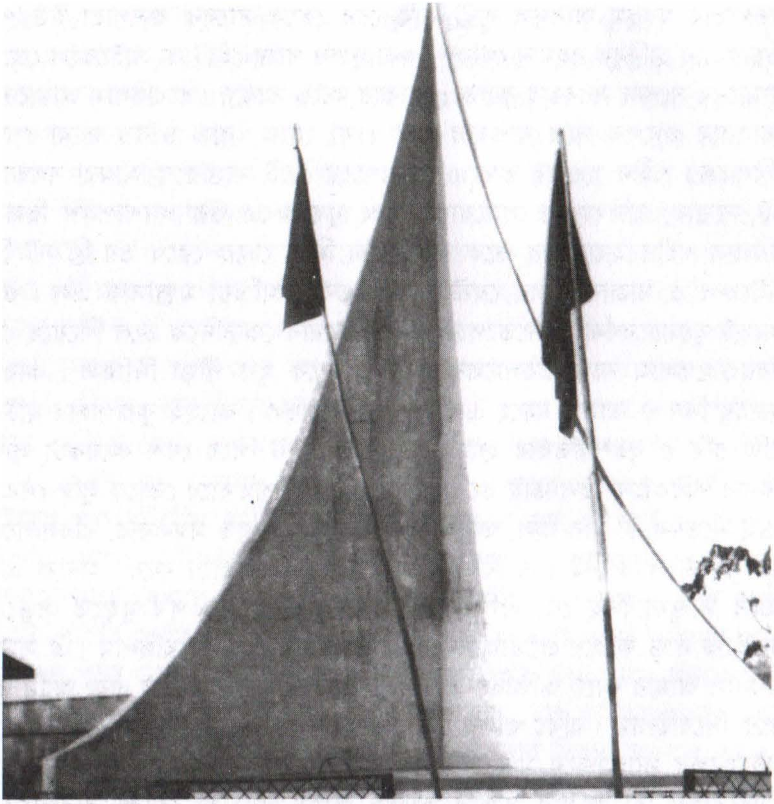


বরইতলার মসজিদ, মুসল্লিদের ব্রাশ ফায়ার করে মেরে ফেলে পাকবাহিনিরা

দক্ষিণ-পূর্বদিকে পূর্ব-পাশের এবং পশ্চিম-উত্তর পাশের যুদ্ধে দিশেহারা পাকসেনা মর্টার থেকে পরপর ২ টি শেল নিক্ষেপ করার পর মুসল্লীদের ব্রাশ ফায়ার করে মেরে ফেলে। কাকতালীয়ভাবে তাদের ভেতর জনৈক আফসার আলী মেম্বার আজও বেঁচে আছেন। বরইতলার ঐ নৃশংস হত্যাযজ্ঞের জীবন্ত

সাক্ষী হয়ে। কালবিলম্ব না করে আমরাও ফায়ার ওপেন করলাম। শুরু হল প্রচণ্ড যুদ্ধ। থেমে গেল মর্টার শেল নিক্ষেপ করা। বনের বাতার ফাঁক দিয়ে সড়কে কাউকে দেখতে পেলাম না। এরই মাঝে বেলা ১টার মত বেজে গেছে। বরইতলা থেকেও আর কোন গুলির শব্দ পাওয়া যাচ্ছিলো না। আমাদের কাছে যোগাযোগের জন্য কোন অয়্যারলেস ছিল না। বড় কোন অস্ত্রও ছিল না, কেবল থ্রি-নট-থ্রি রাইফেল রাশিয়ান এস. এল. আর. ছাড়া অন্য কোন বড় অস্ত্রও ছিল না। একটিমাত্র গ্রেনেড ফায়ারিং রাইফেল ছিল আমাদের। প্রচণ্ড যুদ্ধে আমাদেরও রসদ ফুরিয়ে এসেছিল। পাকসেনারা পড়েছিল ঘেরাও-এর মধ্যে। সিরাজগঞ্জ থেকে অতিরিক্ত সৈন্য শুভগাছা হয়ে পায়ে হেঁটে খামার পাড়ার দক্ষিণ-পশ্চিমে যুদ্ধরত সোহরাবের গ্রুপের পিছন দিক থেকে আক্রমণ চালায়, ফলে সোহরাব গ্রুপ যুদ্ধ বন্ধ করে উত্তরে সরে যেতে বাধ্য হয়। ঐ গ্রুপের রবিলাল দাস বীরের মতো যুদ্ধ করে শহীদ হয়। পাকসেনারা পূর্বদিক দিয়ে বেরিয়ে যেতে সক্ষম হয়। বরইতলা গ্রাম ছিল জনমানবশূন্য। ভোর রাতেই শহীদ হয় মোজাম-বাহিনীর মাথাইল চাপড়ের সুজাবত আলী এবং শামসুল হক বাহিনীর কাচিহারার সামাদ। আমরা সর্বমোট এই তিনজনকে হারাই। রাতে ঘাটিশুভাগাছার আবুবকর তরফদারের বাড়িতে যাই আমি। সেখানে গিয়ে দেখতে পেলাম পাক আর্মি। বাড়িটি ছিল সড়কের পাশে। বড় একটা পাটের গুদাম ছিল বক্কার ভাইয়ের। পাক সেনারা গরুর গাড়িতে করে ৪৯ জন পাক সেনার মৃতদেহ ঐ পাট গুদামের পাট দিয়ে ঢেকে সিরাজগঞ্জে নিয়ে যায়। যারা পাট বয়ে নিয়ে গাড়ি ঢেকে দেয় তাদের দেয়া তথ্য মোতাবেক আমরা নিশ্চিত হই ৪৯ জন পাকসেনার নিহত হওয়ার খবর। শুভাগাছা আসার পথে কুড়িপাড়ায় মনসুর আলী সাহেবের বাড়িতে গিয়ে পেলাম আজকের সিরাজগঞ্জ জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক কে এম হোসেন আলী হাসানকে। হাসান মোজাম-বাহিনীর সদস্য ছিল। আগের রাতে বরইতলায় পাকসেনাদের অতর্কিত আক্রমণের শিকার হয়ে বরইতলা থেকে এখানে এসে তারা ভাইয়ের (মনসুর আলী সাহেবের ভাতিজা) বাড়িতে আশ্রয় নেয়। আমি প্রত্যেকবার যুদ্ধে যাওয়ার আগে (এম.পি.) মিটিং পয়েন্ট নির্ধারণ করে যেতাম। বরইতলা যুদ্ধের আগে কাইলকাপুর হাটের উপর ব্রিফিং দেয়ার সময় এমপি নির্ধারণ করে ছিলাম। প্রথম এম পি ছিল ভেল্লাবাড়ীর পূর্বে চড়ার মধ্যে একটা বেলগাছ ছিল সেই গাছের নীচে। দ্বিতীয় এম. পি. ছিল চকডাকাতিয়া মাদ্রাসা। কথা ছিল সারাদিন পর রাত ৮টায় চকডাকাতিয়া মাদ্রাসায় একত্রিত হওয়ার। আগেই বলেছি আমাদের হাতে কোন অয়্যারলেস ছিল না, যার ফলে আমাদের কোন্ গ্রুপ কোথায় আছে, তা জানার কোন উপায় ছিল না। যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম ছিল আমাদের গ্রামের অর্থাৎ

আলহাজ্ব আবদুস সামাদের ছেলে মো. আনসার আলী ওরফে আনসার এবং শুভগাছার মরহুম আবদুল বারী ডাক্তারের ছেলে সাবেক শুভগাছা ইউ.পি. চেয়ারম্যান হাবিবুর রহমান খোকা। ওরা দুজন পায়ে হেঁটে বা সাইকেলে চেপে আমাদের সংবাদ সরবরাহ করত। খোকার কাছে সংবাদ পেয়েছিলাম আমাদের সোহরাব গ্রুপের সরে যাওয়ার কথা। যা হোক, রাত ৮টায় জানা গেল রবিলালের শহীদ হওয়ার কথা। কান্তনগরের ছোট সাত্তারকে আমরা বলতাম গুটু সাত্তার, রবিলালের সহযোদ্ধা এবং যুদ্ধক্ষেত্রে ওরা পাশাপাশি ছিল। রবিলাল শহীদ হবার পর ওকে কুচুরিপানা দিয়ে ঢেকে রেখে ওর থ্রি নট থ্রি রাইফেল ও মাজার গুলির বেল্টটা নিয়ে চকডাকাতিয়া মাদ্রাসায় এল। ওর কাছেই যুদ্ধের বর্ণনা জানতে পারলাম। সোহরাব কোনদিকে চলে গিয়েছে সে খবরও পেলাম না। রবিলালের মৃত্যু আমাকে খুব পীড়া দিচ্ছিল। কারণ আগের দিন ও আমার কাছে একটা লুঙ্গি চেয়েছিল। কাছেই কুরাগাছার হাট। প্রতি রবি ও বৃহস্পতিবার হাট লাগত। এ হাটে গিয়ে বেশ কয়েকটা লুঙ্গি কেনার পরিকল্পনা ছিল তাই ওকে বলেছিলাম বৃহস্পতিবারে তোকে লুঙ্গি দেব। ১৪ই নভেম্বর কী বার ছিল, তা আজ মনে নেই, সম্ভবত মঙ্গলবার, রবিলালকে লুঙ্গি দিতে পারি নিই। এ বিষয়টা আমাকে আজও তাড়া করে। মনকে এই ভেবে সান্ত্বনা দিই যে, ঐদিন বরইতলা যুদ্ধে যাবার পূর্ব-মুহূর্তে সড়কে সবাইকে দাঁড় করিয়ে প্রত্যেককে ৫০ রাউন্ড করে গুলি দিয়েছিলাম। ঐ সময় রবিলাল আমার কাছে অতিরিক্ত ৫০ রাউন্ড গুলির আবদার করে এবং আমি তা ওকে দিয়েছিলাম। রবির গুলির বেল্টে পেলাম মাত্র ২ রাউন্ড এবং থ্রি নট থ্রি রাইফেলের ম্যাগাজিনে মাত্র ১ রাউণ্ড গুলি। মোট ৯৭ রাউন্ড গুলি কিভাবে চালিয়েছিল তা আমার মাথায় আজও আসে না। যা হোক, রবিলালের মরদেহের সৎকার করা দরকার, তাই কাল বিলম্ব না করে আমি খামার পাড়ার পথে কুড়ি পাড়ায় তারা ভাইয়ের বাড়িতে এসেছিলাম ডোমের খোঁজে। কারণ রবিলাল ছিল ডোম, ওর বাবা বিষ্ণুরাম ছিল মুচি বা ডোম। তারা ভাইয়ের বাড়িতে হাসানকে পেয়ে জানতে পারলাম, আবু ইউসুফ সূর্য কাছেই শ্বশুর বাড়িতে আছে, তাকেও ডেকে আনলাম। তারা ভাই ও হাসানের উপর রবিলালের মৃতদেহের সৎকারের দায়িত্ব দিয়ে চলে এসেছিলাম ঘাটি শুভগাছায় বাংলাবাজারের কাছে আবুবকর ভাইয়ের বাড়িতে। উদ্দেশ্য সোহরাবের খোঁজ করা। জানতে পারলাম, ওরা সিংরাবাড়িতে নিরাপদ আশ্রয়ে আছে। অন্যদিকে পাকসেনাদের মৃতদেহ পাটের ধড়া দিয়ে ঢেকে নেয়ার ছবি স্বচক্ষে দেখতে পেলাম। রবিলালের গর্ভধারিণী মা খুকী বালার কথা মনে পড়ে আজও। ৪২ বছর আগে বাংলাবাজারে প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে আসে খুকি বালা ওর ছেলে



বরইতলায় নির্মিত স্মৃতিসৌধ

রবিলালকে নিয়ে আমার হাতে তুলে দেয়। সেই রবিলালকে আমি ওর মায়ের কাছে ফিরিয়ে দিতে পারি নি, এমন কি সৎকারের আগে ওর মুখটাও দেখাতে পারি নি ওর মাকে। কী জবাব দেব ওর মাকে! সেই ভয়ে ভয়ে আমি ওর মাকে ৩৭ বছর দেখা দিই নি। ৩৭ বছর পর বিটিভি-র ক্যামেরা নিয়ে যাই সামনে। সে এক অভাবনীয় চিত্র। সে তখন পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগী। ওর ছেলে সাককুরাম দাস কোলে করে এনে আমাদের সামনে চেয়ারে বসাল। অবাক দৃষ্টিতে চেয়ে রইল আমার দিকে। আমার পরিচয় পেয়ে জড়িয়ে ধরে কান্না শুরু করল। অবশেষে একজন গর্বিত মায়ের মতো সাক্ষাৎ দিয়েছিল ক্যামেরার সামনে। রবিলালের মা হওয়াতে গর্ব। সে সাক্ষাৎকার বিটিভি থেকে অনেকবার সম্প্রচারিত হয়েছে। বরইতলার যুদ্ধ আজ আর নেই। আছে প্রায়

১১০ জন গ্রামবাসী, আছে বুকের তাজা রক্তে রঙিন করে তাদের বংশধরেরা। কালের সাক্ষী হিসাবে দাঁড়িয়ে আছে বরইতলায় নির্মিত স্মৃতিসৌধ। রবিলালের কবরের উপর একটা মঠ নির্মাণ করে দিয়েছিলাম আমি, কিন্তু বর্তমানে সেটিও নেই। কারণ খামার পাড়া গ্রামের কতিপয় অবুঝ লোক মঠটি ভেঙে নিয়েছে। গ্রামের লোক বুঝতে পারে নি, ঐ ইট-সিমেন্টের তৈরি করা ঐতিহাসিক মঠের কী গুরুত্ব!



বেগম সলিমন নেছা : যাঁর কথা না বললেই না

দোয়েল গ্রামের সেই বৃদ্ধা মহিলা "বেগম সলিমন নেছা" স্বামী জিন্নত আলী (কারী) ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে শপথ গ্রহণ কেরছিলেন যে, যতদিনে এদেশের সোনার ছেলেরা দেশের স্বাধীনতা ছিনিয়ে না আনতে পারবে, যতদিনে শেখ মুজিবুর রহমান এ দেশের মাটিতে ফিরে না আসবে, ততদিন তিনি রোজা রাখবেন। ১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারি যেদিন বঙ্গবন্ধু স্বাধীন বাংলার মাটিতে পা রাখলেন, সেইদিন পর্যন্ত এই মহীয়সী বৃদ্ধামহিলা রোজা রেখেছিলেন। স্বাধীনতার অল্প কয়েকদিন পর ক্যাপ্টেন এম. মনসুর আলী বৃদ্ধামহিলাকে দেখতে এসে জিজ্ঞেস করেছিলেন, "আপনি কী চান?" তিনি বলেছিলেন, "আমি সোনার বাংলা চাই।" '৭১ সালের সাড়ে সাত কোটি মানুষের প্রাণের দাবিই তিনি চেয়েছিলেন।

বরইতলার যুদ্ধের পর হানাদার বাহিনী কাজীপুর থানা থেকে আর বের হয় নি। ফলে দলে দলে রাজাকাররা পালিয়ে এসে সারেন্ডার করতে লাগলো। ওদিকে, আমির হোসেন ভুলু রৌমারী ক্যাম্প থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত আরও মুক্তিযোদ্ধা পাঠালো আমার দলে যোগ দেয়ার জন্য। এলাকার মানুষের মধ্যে প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস ফিরে এলো। লতিফ মির্জার দল বাগবাটীর পশ্চিমে রায়গঞ্জ থানার বর্মগাছায় যুদ্ধ করে শত্রুদের নাস্তানাবুদ করে দিল। তার আগেই তাড়াশের নওগাঁয় লতিফ মির্জার দলের হাতে প্রচণ্ড মার খেয়ে হানাদাররা দুর্বল হয়ে পড়েছে। চারদিক থেকেই ওরা মার খাচ্ছে। সিরাজগঞ্জের পূর্বে যমুনায় কাদেরীয়া বাহিনী, দক্ষিণ-পশ্চিমে লতিফ মির্জার বাহিনী, উত্তরে আমার বাহিনী আর মোজাম বাহিনী এবং উত্তর-পূর্বে জগন্নাথগঞ্জ এলাকায় লুৎফর রহমান

ওরফে নদা বাহিনীর হাতে প্রচণ্ড মার খেয়েছে ওরা। আমার দলে তখন ৩০০ জনের উপরে মুক্তিযোদ্ধা। শুধু কাজীপুরের নয়, ময়মনসিংহ জেলার ৯ জন, রায়গঞ্জের জহুরুল ও নজরুলসহ কয়েকজন এবং সিরাজগঞ্জের ফিরোজ ভূঁইঞা, হাবিবুল্লাহ মদনা বাড়ির আকবর, তোজাম্মেল (বর্তমান আমেরিকা বাসিন্দা), উল্লা পাড়ার সাঈদ, কামারখন্দের তোজাম্মেলসহ আরও নাম-না-জানা অনেক মুক্তিযোদ্ধা।

থানা বিল্ডিং-এর ছাদের উপরে চারকোণায় ৪টা এল. এম. জি. বসিয়ে স্থায়ী বাংকার করে আছে পাকসেনারা। এসব খবর আমার কাছে আছে। রৌমারীতে ইতোপূর্বেই আমি আমির হোসেন ভুলুকে খবর দিয়েছি। ভারী অস্ত্রশস্ত্র পাঠানোর জন্য। থানায় আক্রমণ করতে হলে আর. সি. এল. গান অথবা ৪" ব্যাসের মর্টার দরকার। বিল্ডিংটা ভেঙে দিতে হবে আগে। এসব পরিকল্পনা করে অস্ত্রের অপেক্ষায় আছি। কখনও ডাঙায়, কখনও চরে, কখনও যমুনায় ভাসছি আমরা। ৩০ শে নভেম্বর খবর পেলাম আমার জন্য ভারী অস্ত্র ও গোলাবারুদ রৌমারী থেকে পাঠানো হয়েছে। ১লা ডিসেম্বর টেংলাহাটা গ্রামে আমাদের অবস্থান ছিল। পরবর্তী অবস্থান ছিল খুকশিয়া গ্রামে। সাত্তার ভাই ও সাঈদকে কাজীপুর থানা আক্রমণের কথা জানালাম। বললাম, তোমরা খুকশিয়াতে অবস্থান কর, আমি যমুনা থেকে অস্ত্র নিয়ে তোমাদের কাছে ফিরে আসব ২ তারিখ রাতে, ৩ তারিখ ভোর রাতে আক্রমণ করবো কাজীপুর থানা। আমি ২ তারিখ সকালে যমুনায় পেলাম ইসাহাক ভাইকে। রৌমারী থেকে আমার জন্য ১টা আর. সি. এল. গান ২টা এল. এম. জি. সহ অনেক গোলা বারুদ নিয়ে এসেছে। নৌকায় বসে ইসাহাক ভাইকে আক্রমণের কথা জানালাম। পরিকল্পনা অনুযায়ী ইসাহাক ভাই রাত ১টায় চোরমারা সুইচ গেটের কাছে অবস্থান করবে ডিনামাইট নিয়ে। শত্রুরা সিরাজগঞ্জ থেকে আসলে সুইচ গেইট উড়িয়ে দিয়ে তাদের প্রতিরোধ করবে। ভোর সাড়ে চারটায় কাজীপুর থানায় আর. সি. এল. গান দিয়ে থানা বিল্ডিং ভেঙে আক্রমণ করবো। আমার লোকেরা থানার সমস্ত খবরই আমাকে দিয়েছে। মনটা আনন্দে মেতে উঠলো। ভাবছিলাম এবার কাজীপুর থেকে একটা শত্রুকেও পালাতে দেব না। সব শত্রুদের খতম করবো। জয়লাভের কামনার আনন্দে উৎফুল্ল আমি। দুপুরে অস্ত্র ভর্তি নৌকাটা আমির সরকারের ঘাটে লাগালাম। আমির সরকারের অনুরোধে দুপুরে আমি আর ইসাহাক ভাই দুধভাত খাচ্ছি। হঠাৎ করে কাজীপুর থানার দিক থেকে গুলির আওয়াজ শুনতে পেলাম। ওখান থেকে প্রায় ৪ মাইল দূরে থানা হেড কোয়ার্টার। আমার মাথায় বাজ পড়লো। মুহূর্তের মধ্যে আমার সব পরিকল্পনা যমুনার স্রোতে ভেসে গেল। ভাবলাম রৌমারী থেকে আসা নতুন কোন দল হয়তো থানা আক্রমণ করেছে। ভাত খাওয়া হল না। বাইরে দাঁড়িয়ে গুলির আওয়াজ পরখ করতে লাগলাম। এরই

মাঝে দেখি আমার গ্রামের আনিসুর রহমান সাইকেল নিয়ে আসছে। আনিসুর ও শুভগাছার খোকা ছিল যুদ্ধের সময় বার্তাবাহক। আনিসুরের কাছে শুনলাম আমার বাহিনী থানা আক্রমণ করেছে। আমি মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লাম। কি করবো মাথায় আসছিল না। শুধু ভাবছিলাম আমার ছেলেরা প্রচণ্ড মার খাচ্ছে, মরে শেষ হয়ে যাবে। ইসাহাক ভাই আমাকে কাজীপুরের দিকে যাওয়ার জন্য বললো। নৌকায় আর. সি. এল. গান। গানটা ডাঙায় নামিয়ে পরিষ্কার করলাম। ইসাহাক ভাইয়ের দল থেকে ৬ জনকে সাথে নিয়ে কাজীপুরের দিকে রওনা হলাম। কাজীপুর থানার আগে ছিল কাজীপুর বাজার। ঐ বাজারে যখন পৌঁছোলাম তখন গুলির শব্দ কমে গেল। মাঝে মাঝে চাইনিজ রাইফেলের গুলির শব্দ ছাড়া আর কিছু শোনা যায় না। বাজারে জনসাধারণের চিহ্নমাত্র নেই। কাউকে জিজ্ঞেস করার মত লোক নেই। মুক্তিযোদ্ধারা কোথায় আছে জানি না। আর. সি. এল. গান ব্যবহার করবো কিনা ভাবছি। হঠাৎ মনে পড়লো চাইনিজ রাইফেলের গুলির জবাবে কোন গুলি আসছে না। তার মানে আমার ছেলেরা ওখানে নেই। কাজেই এ অবস্থায় আর. সি. এল. ব্যবহার করা সমীচীন নয়। পাক-আর্মিরা অতি সহজেই আমাকে পাকড়াও করতে পারে। কারণ থানা থেকে ৩০০ গজ দূরে আমার অবস্থান ছিল। দক্ষিণে প্রায় ২ মাইল রাস্তা ঘুরে থানার পশ্চিমে সাউট তলার পশ্চিমে যখন গেলাম তখন ভীত-সন্ত্রস্ত দু'একজন মানুষ পেলাম। হঠাৎ পেলাম বিলদুয়ারিয়ার আজমল ভাইকে। জানলাম, মুক্তিযোদ্ধাদের অবস্থান কোথায়। মেঘাই হাইস্কুলে ওদের সাথে মিলিত হলাম। বেলা ১টা থেকে সন্ধ্যে ৬টা পর্যন্ত ওরা যুদ্ধ করেছে। প্রতিটি ছেলেই আধামরা হয়ে আছে। আমার অতি বিপ্লবী দুই নেতা সাত্তার ভাই ও সাঈদ অপরাধীর মতো সামনে এসে দাঁড়ালো মাথা নীচু করে। সাঈদ বলে ফেললো, লিডার আমাদের ভুল হয়েছে। আমার বাল্যবন্ধু সোহরাব আমাকে জানালো যুদ্ধে চরকাজীপুরের চাঁদ মিয়া শহীদ হয়েছেন। আহত হয়েছে কামারখন্দের তোজাম্মেল, বুরুঙ্গীর একরামুল হক, তেকানীর আমজাদ, দুবলাইয়ের আয়নাল। চাঁন মিয়াকে ওরা আনতে পারে নি। ওকে সাংঘাতিকভাবে আহত অবস্থায় আর্মিরা ধরে নিয়ে কুড়াল দিয়ে কুপিয়ে তিন টুকরা করে হানাদারদের পৈশাচিক তৃপ্তি মিটিয়েছে। মেঘাই স্কুলে রান্নাবান্না হচ্ছে। আহতরা আছে বেড়ী পটলে। সাথে আছে ডাক্তার গোলাপ ভাই ও ডাক্তার ফজলার রহমান। আমি বেড়ী পটলে গিয়ে পেলাম শুধু তোজাম্মেলকে। গুলিতে তার মুখের নীচের চোঁয়ালটা পড়ে গেছে। আমি ওর মাথাটা কোলে তুলে নিতেই ও মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লো। ঐ বেড়ী পটলেই ওকে সমাধিস্থ করার নির্দেশ দিয়ে গান্ধাইল নয়াপাড়ায় বাকী আহতদের দেখতে গেলাম। একরামুলসহ অন্যদের পেলাম। সার্বক্ষণিক ডাক্তার গোলাপ ভাইকে ওখানে রেখে ফিরে এলাম। মেঘাই স্কুলে প্রায় ভোর হয়ে গেছে।

খাওয়া-দাওয়া সেরে সবাই একটু বিশ্রাম নিচ্ছে। আমি কাজীপুর থানা আবারও আক্রমণ করার জন্য সিদ্ধান্ত নিলাম। অগ্রসর হলাম থানার দিকে। সাউথ তলা গ্রামের পূর্বপাশেই থানা। গ্রামের ভিতর দিয়ে পূর্বদিকে অগ্রসর হচ্ছি। কাক-ডাকা ভোরো দু'একজন ঘরের বাইরে পাওয়া গেল। এলাহী ডাক্তারের ছেলে জাহাঙ্গীরকে পেলাম। জাহাঙ্গীর জানালো, হানাদারেরা ওদের অনেক লাশ নিয়ে থানা থেকে পালিয়েছে। আমরা থানায় উঠে পড়লাম। তিন খণ্ডিত চাঁন মিয়ার লাশ পেলাম। সাউথ তলা গ্রামবাসীরা চাঁনমিয়ার মৃতদেহ নিয়ে গেল শেষকৃত্য সমাধা করার জন্য। আমি থানায় স্বাধীন বাংলার পতাকা ওড়ালাম। ৩রা ডিসেম্বর সকালে কাজীপুর আমরা হাতে পেলাম পরিপূর্ণভাবে। হারালাম চাঁদ মিয়া ও তোজাম্মেলকে।

৩রা ডিসেম্বর কাজীপুর স্বাধীন হলো। ১৬ মাইল দক্ষিণে সিরাজগঞ্জ শহরে মিলিটারী। ৮ মাইল পশ্চিমে বগুড়ার ধুনুট থানা হেড কোয়ার্টারে মিলিটারী। ৬ মাইল উত্তরে চন্দনাবাইশার হানাদার বাহিনীর ঘাঁটি। যে-কোন মুহূর্তে শত্রু আক্রমণ করতে পারে। আমরা শপথ নিলাম একজন মুক্তিযোদ্ধা বেঁচে থাকতে কাজীপুরের এক ইঞ্চি মাটি হানাদারদের দখলে যেতে দেব না। সর্বমোট ৪০০ জন মুক্তিযোদ্ধা আমার দলে। এর মধ্যে ১০০ জনের মত স্থানীয় যুবক ও সারেন্ডার করা রাজাকার। সমগ্র থানাটা অরাজকতায় ভরে গেছে। ঘোষণা করে দিলাম মুক্তিযোদ্ধাদের শাসনের কথা। মুক্তিযোদ্ধাদের ৪ ভাগে ভাগ করলাম। এক গ্রুপ সাত্তার ভাইয়ের নেতৃত্বে ধুনুটের কাছে সোনামুখীতে অবস্থানের জন্য পাঠালাম। চন্দনবাইশার কাছে ধূলাউড়িতে পাঠালাম সাঈদের দলকে। বাংলাবাজারে পাঠালাম আমার বাল্যবন্ধু সোহরাবের নেতৃত্বে আর একটি দল। অবশিষ্টদের নিয়ে আমি রইলাম থানা হেড কোয়ার্টারে। থানার দাতব্য চিকিৎসালয়কে হাসপাতাল বানিয়ে আহতদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করলাম। হাসপাতাল পরিচালক গোলাপ ডাক্তার। সার্বক্ষণিক নার্সিংয়ের কাজে জাহাঙ্গীর। স্থানীয় জনগণের সহযোগিতায় পূর্ণ প্রশাসন কায়েম করতে সক্ষম হলাম। লতিফ মির্জার পলাশডাঙা যুবশিবিরের মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে তাড়াশের নওগাঁ, রায়গঞ্জের ব্রহ্মগাছা, জামতৈল ব্রিজ, দিলপাশার ব্রিজ ও হান্ডিলের যুদ্ধে প্রচণ্ড মার খেয়েছে শত্রুরা। কাজীপুরের পতন ঘটার পর ওরা দিশেহারা হয়ে সিরাজগঞ্জে আশ্রয় নিয়েছে। শুধু হানাদাররা নয়, ওদের এদেশীয় দোসররাও সিরাজগঞ্জে সমবেত হয়েছে। মুক্তিযোদ্ধারা আসছে দলে দলে। চারদিকে বিজয় উল্লাস। অনেক অমুক্তিযোদ্ধা, যারা এতদিন ঘুমিয়ে ছিল, তারাও এসে ভিড় জমাতে লাগলো। ৮ই ডিসেম্বর আমির হোসেন ভুলু রৌমারী থেকে সিরাজগঞ্জ আসলো।

মাইনকারচরের কাছাকাছি নতুন বন্দর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রথমে একটা Youth Camp স্থাপন করেন আমির হোসেন ভুলু, জহরুল ইসলাম মিন্টু এবং

ইসমাঈল হোসেন প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ। এখানে পরিদর্শনে আসেন তৎকালীন এম.পি. সৈয়দ হায়দার আলী, অধ্যাপক ইউসুফ এবং জনাব রওশনুল হক এমপি। নতুন বন্দরের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্থান সঙ্কুলান না হওয়ায় ক্যাম্পটি বাংলাদেশের অভ্যন্তরে রৌমারী থানা সদরে স্থানান্তর করা হয়। জনাব আমির হোসেন ভুলুর সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধানে এখানে বৃহত্তর পাবনা জেলার যুবকেরা সমবেত হতে থাকে। ক্যাম্পটির পরির্দশনে জনাব মোতাহার হোসেন এম. এন. এ. সহ আরও অনেক নেতৃবৃন্দ আসেন। জহুরুল ইসলাম মিন্টু, সঙ্গে কামাল ছিলেন নিয়মিত শরীর চর্চার প্রশিক্ষক। জনাব ইসমাঈল হোসেন আবদুর রউফ পাতা, গোলাম হায়দার খোকাসহ আরও অনেকেই এখানে বিভিন্ন দায়িত্বে নিয়মিত ছিলেন। এখান থেকে যুবকদের বাছাই করে ভারতের BSF কর্তৃক পরিচালিত নেপাল জলপাহতি সীমান্তের ৬নং মুরতি ক্যাম্পে পাঠানো হত সামরিক প্রশিক্ষণের জন্য। সামরিক প্রশিক্ষণ শেষে আবার রৌমারিতেই ফেরৎ আসত মুক্তিযোদ্ধারা। এই রৌমারী ক্যাম্পটি ট্রানজিট ক্যাম্প হিসেবে ব্যবহৃত হত। এখানে ভারতের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ক্যাম্প থেকে আসা মুক্তিযোদ্ধারা দেশের অভ্যন্তরে আসত নৌপথে। সামরিক অস্ত্র, প্রশিক্ষণরত এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য নিরাপদ ছিল ক্যাম্পটি।

মুক্তিযুদ্ধে রৌমারী ক্যাম্প (মুক্তাঞ্চল, কুড়িগ্রাম)

একটা জাতির জীবনে হাজার বছরে একটা মুক্তিযুদ্ধ হয়। তাই বাঙালি জাতির হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ সময় ছিল ১৯৭১। শ্রেষ্ঠ অর্জন বাংলার স্বাধীনতা। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বীর একাত্তরের মুক্তিযোদ্ধারা। যে-কোন জাতির ভাগ্যে হাজার বছরেও এমন অসীম ত্যাগ আর অনন্য বীরত্ব প্রদর্শনের সুযোগ আসে নি, যা এসেছিল ১৯৭১-এ বাঙালির জীবনে। জাতির শ্রেষ্ঠ অর্জন সেই স্বাধীনতার জন্য হাজার হাজার মুক্তিযোদ্ধা ও স্বাধীনতাকামী ছাত্র-জনতা তাদের বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দিয়েছে মাতৃভূমির সবুজ-শ্যামল মাটিতে। আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে একদিকে যেমন রয়েছে দখলকার পাকবাহিনীর অমানবিক নির্যাতনের ঘটনা, তেমনি রয়েছে মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বপূর্ণ অবদানের অনন্য গৌরবগাঁথা অসংখ্য ঘটনা। সব মিলিয়ে আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধ যেন এক অতুলনীয় আনন্দ-বেদনার মহাকাব্য! অজস্র মানবিক ঘটনার মালায় গাঁথা আমাদের মুক্তিযুদ্ধের বিস্তৃত ভুবন। আর তাই মুক্তিযুদ্ধের কথা বলতে হবে এবং পরবর্তী প্রজন্মকে জানাতে হবে, বলতে হবে দীর্ঘকাল ধরে, হাজারো কণ্ঠে এবং অজস্র ধারায় যাতে জ্বলবে একাত্তরের অগ্নিশিখা। সমরাস্ত্রের নিয়ম অনুযায়ী এই অবিশ্বাস্য ও অসম যুদ্ধে (আধুনিক সমরাস্ত্রের বিরুদ্ধে আমাদের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ব্যবহৃত ৩০৩ রাইফেল) সদা জাগ্রত থাকতো আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা। ভয়-ভীতি কিছুই ছিল না। নিঃস্বার্থ দেশপ্রেম

এবং এদেশের নিরস্ত্র-অসহায় মানুষকে পাকহানাদার বাহিনীর মরণ ছোবল থেকে রক্ষা করা ছিল প্রতিটি মুক্তিযোদ্ধার একমাত্র উদ্দেশ্য। বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার মানুষের অংশগ্রহণে এটা জনযুদ্ধের রূপ নিয়েছিল।

রৌমারী ক্যাম্প থানা রৌমারী মুক্তাঞ্চল কুড়িগ্রাম (সিরাজগঞ্জের জন্য স্থাপিত)

সিরাজগঞ্জ জেলার শতাধিক মুক্তিকামী মুক্তিযোদ্ধা মাতৃভূমিকে পাকহানাদার বাহিনীর হাত থেকে মুক্ত করতে মেছড়া নদীঘাট থেকে ৫টি নৌকাযোগে ভারতের সীমান্তের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করে এবং বক্ষ্মপুত্র নদী ধরে যেতে থাকে, যেহেতু নদীর উৎপত্তি বা উৎসস্থল ভারত, তাই যেতে যেতে একসময় মেঘালয় ও আসাম সীমান্তে ভারতের বিখ্যাত যোদ্ধা মোঘল সেনাপতি মীর জুমলার মাজার ও কামাক্ষ্যা মন্দিরের পাশে মাইনকারচর নামক স্থানে পৌঁছে যায়। ওখানে ভারতীয় সীমান্তবর্তী (BSF) ক্যাম্পে যোগাযোগ করে সবার উদ্দেশ্য কার্যাবলী, অবস্থান সম্পর্কে অবগত করা হয় এবং প্রয়োজনীয় সাহায্য-সহযোগিতা চাওয়া হয় এবং আলোচনা শেষে সীমান্ত সংলগ্ন নতুন বন্দর নামক স্কুলে সবাই সর্বপ্রথম মুক্ত-বাংলার প্রথম সামরিক-ক্যাম্পের যাত্রা শুরু করি। বলাবাহুল্য, সবার অস্ত্র ছিল খুবই সামান্য।

মাইনকারচর (আসাম)-এর সংলগ্ন বাংলাদেশ ভূ-খণ্ডে নতুন বন্দর স্কুলে মে মাসের ৭ তারিখে সব যোদ্ধার থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থাসহ স্কুলের মাঠে সবার সহযোদ্ধাদের নিয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। প্রতিদিনই মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা বাড়তে থাকায় ঐ স্কুলে সবার থাকা, রাত্রিযাপন বা খাওয়ার খুবই অসুবিধা হচ্ছিল। তাই পরবর্তীতে সবাই সীমান্ত থেকে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে আরও ৫ কিঃ মিঃ অভ্যন্তরে (ভিতরে) রৌমারী থানা এলাকা (তখন সম্পূর্ণ ফাঁকা ছিল) এবং অনেক বেশী জায়গা, ছিল পুলিশের জন্য আবাসিক বাসা ও বড় প্রশিক্ষণের মাঠ, তাই সবাই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে রৌমারী থানার বৃহত্তর এলাকায় ক্যাম্প স্থাপনের। সেইমত স্থানান্তর করা হয় মে মাসের ২৬ তারিখে। এই ক্যাম্পের উপদেষ্টামণ্ডলীর দায়িত্ব পালন করেন (১) জনাব মরহুম মোতাহার হোসেন তালুকদার (এম এন এ) (২) জনাব সৈয়দ হায়দার আলী (এম পি) (৩) মরহুম রওশন-উল-হক (এম পি) (৪) আবদুল মমিন তালুকদার (এম পি) (৫) জনাব আনোয়ার হোসেন রতু (সাধারণ সম্পাদক আওয়ামী লীগ) (৬) মরহুম শহীদুল ইসলাম তালুকদার (আওয়ামী লীগ নেতা) সার্বিক সহযোগিতায় মরহুম আমির হোসেন ভুলু (আওয়ামী লীগ নেতা) ক্যাম্প ইনচার্জ জনাব ইসমাঈল হোসেন, ডেপুটি ক্যাম্প ইনচার্জ হিসেবে নিয়োজিত জনাব গোলাম হায়দার খোকা। মাঠ পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন জনাব

জহুরুল ইসলাম মিন্টু। ডাক্তারের দায়িত্ব পালন করতেন (ইন্টার্নী করা অবস্থায় মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন) ডাঃ মতিয়ার রহমান (গাবতলী, বগুড়া)।

পরবর্তীতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক মুক্তিযোদ্ধার জন্য অনুমোদিত ৩০০ মুক্তিযোদ্ধার খাবারের জন্য রেশনিং-এর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। যদিও ক্যাম্পটি সিরাজগঞ্জের তবুও টাঙ্গাইল, বগুড়া, গাইবান্ধা, নওগাঁ, জামালপুর ও রংপুরের ছেলেরাও যোগ দিত এবং প্রশিক্ষণ নিত। কিন্তু ক্যাম্পে মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা প্রতিনিয়ত বাড়তে বাড়তে ১০০০-২০০০ পর্যন্ত হচ্ছিল। যাতে ৩০০ (তিনশ') মুক্তিযোদ্ধার খাবারের রেশন পুরো দিনে অর্থাৎ ২৪ ঘণ্টায় এক বেলা আধা পেট খেয়ে ও সব ভুলেও কঠিন প্রশিক্ষণে নিয়োজিত থাকতো। ইতোমধ্যে কিছুসংখ্যক ই.পি. আর. আনসার পুলিশ ক্যাম্পে যোগ দেয়। প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে মূলত শরীরচর্চা, যুদ্ধের বিভিন্ন বিষয়াদি, যেমন– সামান্য ডামি ও রাইফেলের সঙ্গে বাঁশ বা কাঠ দিয়ে তৈরি ডামি রাইফেলের সাহায্যে পজিশন নেয়া, এইম করা, ক্রল করা, শত্রুর উপর আক্রমণ পরিচালনা, শত্রুর আক্রমণের মুখে পিছু হটে আসাসহ বিভিন্ন বিষয়ের উপর আলোচনাসহ যুদ্ধের অন্যান্য কলাকৌশল যেমন শত্রুর সংবাদ সংগ্রহ, হাইড আউট স্থাপন, পেট্রোলিংসহ বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণার্থীদের সম্যক ধারণা দেয়া হত। পরবর্তীতে বিভিন্নভাবে অস্ত্র সংগ্রহের পর অস্ত্রসহ প্রশিক্ষণ দেয়া হত। তাদের একমাত্র লক্ষ্য শত্রু নিধন। বাংলাদেশের নিরীহ ও নিরস্ত্র মানুষকে রক্ষা করতে ও শত্রু হননের অদম্য স্পৃহায় প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ব্যবহৃত ৩০৩ (তিনশ' তিন) রাইফেল স্টেনগান ও ঐ জাতীয় পুরানো অস্ত্রের সঙ্গে কিছু সংখ্যক সংগ্রহে নিয়েই ওদের শত্রুর মোকাবেলা করতে হত। যা শুধু অদম্য মনোবলের জন্য সম্ভব ছিল। পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রকৌশলী মরহুম মোজহারুল ইসলামকে (পরবর্তীতে প্রধান প্রকৌশলী) সরকার নিয়োগ দান করেন বিভিন্ন ক্যাম্পের প্রয়োজনীয় বিভিন্ন বিষয় দেখ্‌ভাল ও অন্যান্য বিষয়ে সরকারকে অবহিত করার জন্য ৩/৪টি ক্যাম্পের দায়িত্ব প্রদান করেন।

মুক্তিপাগল ছেলেরা দল বেঁধে ক্যাম্পে আসতে থাকায় এবং স্থান সঙ্কুলান না হওয়ায় পরবর্তীতে সিরাজগঞ্জ জেলার জন্য আরও একটি ক্যাম্পের অনুমোদন নিয়ে প্রথমে কাকরীভিটা, মরণটিলা (মাইনকারচর থেকে ২.৫ কিঃ মিঃ দূরত্বে) স্থানে প্রশিক্ষণের জন্য ইয়থ ক্যাম্প স্থাপন করা হয়। পরবর্তীতে মেঘালয়ের মহেন্দ্রগঞ্জে (রৌমারী ক্যাম্প হতে ২৩/২৪ কিঃ মিঃ দূরত্বে) অবস্থান করাতে তুরাতে সামরিক প্রশিক্ষণ দেয়া হতো এবং প্রশিক্ষণ শেষে রৌমারী হয়ে ভিতরে প্রবেশ করতো। ঐ ক্যাম্পের সার্বিক পরিচালনার দায়িত্ব নেন উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্য জনাব হায়দার আলী (এম পি) ও মরহুম রওশন- উল-হক (এম পি)। মুক্তিযুদ্ধে ব্যবহৃত বা যাতায়াতের সুবিধার জন্য ১টি লঞ্চ মাইনকার চর (মীর জুমলার মাজরের ঘাটে)/রৌমারী থানা ঘাটে

সার্বক্ষণিকভাবে ব্যবহারের জন্য রাখা হত। মেজর শাফায়াত জামিল তৃতীয় বেঙ্গল রেজিমেন্ট অধিনায়ক। প্রায় প্রতিদিন বিভিন্ন রণাঙ্গনে পরিদর্শনের জন্য যেতেন। ক্যাম্পসংলগ্ন লঞ্চের অবস্থান থাকতো তাই তিনি মাঝেমাঝেই আমাদের ক্যাম্পে এসে পরিদর্শন ও আলাপ-আলোচনা করতেন এবং উপদেশ দিতেন। লঞ্চে উপরে (ডেকে) যেহেতু তিনি একা থাকতেন তাই মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ, প্রতিরোধ, উপদেশ ইত্যাদি বিষয়ে কথা বলার জন্য প্রায়ই ইসমাঈল বা গোলাম হায়দার খোকাকে সঙ্গে নিয়ে বিভিন্ন রণাঙ্গনের অবস্থা ও মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয়ে ধারণা দিতেন। অত্যন্ত মেধাবী, বিচক্ষণ, তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন, অসীম সাহসী, তড়িৎ সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী, দক্ষ ও সদালাপী ছিলেন, তাই সবার সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতার জন্য তিনি সবার সামরিক ও বিস্ফোরক বিষয়ে বিশেষ প্রশিক্ষণের জন্য মনোনীতসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। ইসমাঈল, আবদু রউফ পাতা, গোলাম আম্বীয়া ও গোলাম হায়দার খোকা ভারতীয় মেঘালয় রাজ্যের গারো পাহাড়ের গহীন অরণ্যে প্রথম, তৃতীয় ও অষ্টম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সমন্বয়ে তেলঢালা নামক স্থানে যেখানে (“Z”) জেড ফোর্সের ব্রিগেড (HQ) হেড কোয়ার্টার স্থাপিত হয়। সেখানে (HQ) এ রিপোর্টের পর আমাদের পাঠানো হয়েছিল প্রথম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অধীনে প্রশিক্ষণের জন্য। ইউনিটে যারার সময় পথিমধ্যে কাকতালীয়ভাবে দেখা হয় আমাদের সিরাজগঞ্জ কলেজের ইংরেজির অধ্যাপক জনাব আশরাফুল ইসলাম স্যারের সঙ্গে। তিনি তখন ফ্লাইট লেঃ (বিমান বাহিনীতে থেকে বিদ্রোহ করেন) তৃতীয় বেঙ্গল রেজিমেন্টের এ্যাডজুটেন্টের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। (পরবর্তীতে বিমান বাহিনীর স্কোয়াডোন লিডার) সবাইকে হঠাৎ উৎফুল্ল হয়ে এবং কুশল জিজ্ঞাসার পর জুনিয়র অফিসারকে জিজ্ঞাসা করলেন সবার গন্তব্য সম্পর্কে। সবকিছু জানার পর উনি হেড কোয়ার্টার থেকে অনুমতিসহ সকলকে প্রথম বেঙ্গল রেজিমেন্টের পরিবর্তে তৃতীয় বেঙ্গলে তার অধীনে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন সে, যা সবার সৌভাগ্যে বার্তা হয়ে আসে। তেলঢালায় আমাদের প্রশিক্ষণের জন্য তৃতীয় বেঙ্গল-এর জায়গাটি ছোট ছোট পাহাড় ঘন জঙ্গলে ভর্তি। এখানে সাপ, জোঁক আর বুনো শুয়োরসহ মাঝে-মধ্যে বাঘের দেখাও মিলত।

রৌমারীর প্রতিরক্ষায় :

সৌভাগ্যক্রমে তেলঢালায় তৃতীয় বেঙ্গল রেজিমেন্টে ফেরার পরই মেজর শাফায়েত জামিল বাংলাদেশে মুক্তাঞ্চলে আসেন। জেড ফোর্স কমান্ডার মেজর জিয়া রৌমারী থানার প্রতিরক্ষা জোরদার করার দায়িত্ব দিলেন মেজর শাফায়েত জামিলকে। রৌমারী থানা ও রাজীবপুর এলাকা তখন মুক্ত এলাকা। বার বার পাক আক্রমণের মুখে সামান্য সেকেলে অস্ত্র নিয়ে মাঝে-মধ্যেই

ভীষণ চাপের মুখে থাকতে হতো, তাই আক্রমণ হলে নিরস্ত্র মুক্তিযোদ্ধাদের (যারা সদ্য প্রশিক্ষণের জন্য আসত) তাদের নতুন বন্দরে নিয়ে আশ্রয়ের স্থান পরিবর্তনের মাধ্যমে ব্যবস্থা নিতে হতো। জুলাইয়ের শেষের দিকে পাকবাহিনী চিলমারী এবং বাহাদুরাবাদ থেকে অগ্রাভিযান শুরু করলে রৌমারীর প্রতিরক্ষা হুমকির মুখে পড়ে। উল্লেখ্য, ৩১শে মার্চ সৈয়দপুর ক্যান্টনমেন্টে তৃতীয় বেঙ্গলের ওপর পাকিস্তানি সৈন্যদের হামলায় পালিয়ে আসা ৩০/৩২ জন নিয়মিত সেনা সদস্যের একটি বিচ্ছিন্ন অংশ নায়েব সুবেদার আলতাফ আর হাবিলদার মনসুরের নেতৃত্বে সংগঠিত হয়। আলতাফ ঐ ক'জন সেনাসদস্য এবং ছাত্র-যুবক-কৃষকদের নিয়ে দু' থেকে আড়াইশো লোকের একটা বাহিনী গড়ে তুলে রৌমারীর চর রাজীবপুরে প্রতিরক্ষায় অবস্থান নেয়। আগস্টের প্রথম সপ্তাহে মেজর শাফায়েত জামিল তাঁর অধীনের লে. নবী ও ক্যাপ্টেন আনোয়ারকে রৌমারীর প্রতিরক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত করেন। পরবর্তীতে আগস্ট মাসে স্কুল মাঠে (আমাদের ক্যাম্পের কাছেই) বাংলাদেশ সামরিক বহিনীর তত্ত্বাবধানে একটি প্রশিক্ষণ ক্যাম্প প্রতিষ্ঠিত হয় লেঃ নূরুন্নবী (পরবর্তীতে লেঃ কর্ণেল) ও ক্যাপ্টেন আনোয়ার (পরবর্তীতে মেজর জেনারেল) তাঁদের অধীনে সুবেদার আলতাফ ও সুবেদার আব্দুল ওহাবের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন সৈন্যের সঙ্গে আরও ছাত্র কৃষক ও যুবকদের সংগঠিত করে পাঁচশতাধিক মুক্তিযোদ্ধাসহ রৌমারীর চর রাজীবপুরে প্রতিরক্ষা অবস্থান নেয়। কুর্ত্তিমারী (সুবেদার আবদুল ওয়াহাব), কোদালকাঠি (সুবেদার কালাম), রৌমারী থানা, রাজিবপুর থানা (সুবেদার আলী নেওয়াজ) বাহাদুরাবাদ ঘাটের উত্তর দিকসহ ঘুঘুমারী (রৌমারী থানা সদর থেকে ২০ মাইল উত্তরে) আশেপাশের প্রায় ৫০-৬০ মাইল এলাকা মুক্তাঞ্চল হিসেবে ঘোষিত ছিল এবং সেই অঞ্চলের প্রতিরক্ষা দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন।

তখন তাঁদের নেতৃত্বে রৌমারী স্কুলে আরও একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র বা ক্যাম্প চালু করা হয়, যারা পরবর্তীতে বিভিন্ন স্থানে বা এলাকায় মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে এবং এর মধ্যে ছাত্র আকতারের নেতৃত্বে একটি "স্টুডেন্ট কোম্পানি" নামে পরিচিত ছিল (জনাব আকতার পরবর্তীতে সেনাবাহিনীতে যোগ দেন, সবশেষে আমার জানামতে কর্ণেল পদে উন্নীত হয়)। এ সময় ইপিআর-এর দুটো লঞ্চ ছিল, ২৫ মার্চের ক্র্যাকডাউনের পরই ইপিআর-এর চালকরা লঞ্চ দুটো নিয়ে মাইনকার চরে অবস্থান নেয়, মোগল সেনাপতি মীর জুমলার মাজারসংলগ্ন নদীর ঘাটে এবং পরবর্তীতে রৌমারী থানা ঘাটে একটি লঞ্চ ভেড়ানো বা বাঁধা থাকতো। লঞ্চে করে প্রায় প্রতিদিনই রৌমারী এলাকাসহ কুর্ত্তিমারী, কোদাল কাঠি, রাজিবপুর এবং দেওয়ানগঞ্জ থানার বিভিন্ন এলাকায় পরিদর্শনে যেতেন মেজর জামিল। পরবর্তীতে বন্যার পানি কমে যাওয়ায়

একটি লঞ্চ সার্বক্ষণিক রৌমারী থানা ঘাট এলাকায় রাখা হতো। একদিন রৌমারী থানার খোলা মাঠের মধ্যে বেশ কিছু মুক্তিযোদ্ধা ছেলেরা পিটি করছে। তাদের সংখ্যা অন্ততঃ পাঁচ-ছয়শো হবে। এরকম একটি সুশৃঙ্খল ক্যাম্পের খবর বোধ হয় "ত" জেড ফোর্সের অধিনায়কের জানা ছিল না। মেজর জিয়া বললেন, (লঞ্চে ওঠার আগে নেমে এলেন) "এরা কে, কারা, উদ্দেশ্যই-বা কি, একটু খোঁজখবর নেয়া দরকার"। তীরে নেমে মাঠে শরীরচর্চা পরিচালনা করা দেখছিলেন জিয়া। তরুণদের শরীরচর্চা করানো হচ্ছিল। শারীরিক ও মানসিকভাবে মুক্তিযুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় সামরিক প্রশিক্ষণের জন্য প্রস্তুত করে তোলার লক্ষ্যে। ছেলেগুলোর চেহারা অত্যন্ত শুষ্ক ও মলিন। মুক্তিযোদ্ধাদের কাছ থেকে যখন শুনলেন ক'দিন ধরে একপেট-আধাপেট খেয়ে পিটি করছে এরা। দুই বেলা খাবার সংস্থান নেই, তবু কারো মুখে কিন্তু টুঁ শব্দটি নেই। এদের অদম্য মনোবল আর দেশাত্মবোধের পরিচয় পেয়ে উচ্ছ্বসিত প্রসংশা করেছিলেন। সেদিন মেজর জিয়া বললেন, "শাফায়াত, তোমাদের তো অনেক সময় বাড়তি রেশনটেশন থাকে। মাঝে-মধ্যে এদের জন্য কিছু পাঠিয়ে দিও"। ২ (দুই) দিন পর সুবেদার আলতাফ একটি নৌকায় ১৬ (ষোল) বস্তা চাল ও ৫ (পাঁচ) বস্তা আটা আমাদের ক্যাম্পে পাঠিয়ে দেন। রৌমারী ক্যাম্প থেকে নিয়মিতভাবে সেনাবাহিনীর বিভিন্ন রেজিমেন্টে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। তাতে কখনও ২৫-৩০ জন, কখনও ৫০-৬০ জন, কখনও ১২০-১২৫ জন করে প্রতি গ্রুপে ভাগ করে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বা রেজিমেন্টে উচ্চতর সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করত। যেমন মহেন্দ্রগঞ্জের তুরা, দেরাদুনসহ ৭ নং ও ৫ নং সেক্টরের অন্যান্য সামরিক ঘাঁটিতে প্রশিক্ষণ দেয়া হত। প্রশিক্ষণ শেষে রৌমারী হয়ে অস্ত্রসহ দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করত। মেঘালয়ের তেলঢালায় তৃতীয় বেঙ্গল রেজিমেন্টে রৌমারী থেকে নেয়া প্রায় ১২৪ (একশ' চব্বিশ) জন প্রশিক্ষিত চৌকস ছাত্রদেরকে রিক্রুট করে উচ্চতর ট্রেনিং দিয়ে তৃতীয় বেঙ্গলের জন্য একটি আলাদা (FF) কোম্পানি গঠন করেন। তারা ৩য় বেঙ্গল রেজিমেন্টে আত্মীকরণ করে নেয়। তাদের প্রথমে হাতীবান্ধা ও পরবর্তীতে ছাতক ও সিলেট রণাঙ্গনে প্রেরণ করে এবং রণাঙ্গনে সফলভাবে অপারেশন পরিচালনা করে। ঐ কোম্পানির ছেলেদের জন্মস্থান সিরাজগঞ্জে অর্থাৎ পরিচিত স্থান ও পরিবেশে যুদ্ধ করার জন্য বাসনা, উদ্বেগ ও ইচ্ছা প্রকাশ করায় (গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রী) মরহুম এম. মনসুর আলীর সক্রিয় হস্তক্ষেপে নভেম্বর মাসের শেষদিকে তাদের নিয়মিত সেনাবাহিনী থেকে রৌমারী ক্যাম্প হয়ে নায়েব আলীর নেতৃত্বে ও ইঞ্জিনিয়ার আহসান-এর নেতৃত্বে আরও ১২৫ জন একটি প্রশিক্ষিত মুক্তিযোদ্ধা যোগ দেয় সিরাজগঞ্জ জেলাকে মুক্ত করার লক্ষ্যে, সিরাজগঞ্জে মুক্তিযোদ্ধাদের

শক্তি বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে। সিরাজগঞ্জের বিভিন্ন স্থানে অপারেশনে অংশ নেয় এবং নভেম্বরে তাদের কোম্পানিটিকে ফেরৎ এনে সিরাজগঞ্জে যুদ্ধ পরিচালনা করতে হয়। কয়েকটি যুদ্ধে তারা অসামান্য বীরত্ব প্রদর্শন করে। ইতোপূর্বেই যুদ্ধরত যে– সকল মুক্তিযোদ্ধার দলকে এবং আকতার হোসেন-এর নেতৃত্বে ১টি, নায়েব আলীর নেতৃত্বে ১টি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। ১২ই ডিসেম্বর শৈলাবাড়িতে পাকবাহিনীর সঙ্গে সিরাজগঞ্জ শহর মুক্ত করার মানসে মুক্তিযোদ্ধারা সিরাজগঞ্জে বিভিন্ন মুক্তিযোদ্ধা– গ্রুপ অর্থাৎ যুদ্ধরত সমস্ত মুক্তিযোদ্ধা-গ্রুপকে সিরাজগঞ্জের শহর থেকে ৭ কিঃ মিঃ উত্তরে ছোনগাছা মাদ্রাসা মাঠে ১২ই ডিসেম্বর সকাল ১০.০০ টায় সমবেত করে বিভিন্ন গ্রুপের দলনেতাদের প্রতেকে প্রত্যেক মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে সরাসরি পরিচিত হওয়া, যাতে সবাই সবাইকে চেনে এবং সব গ্রুপ একত্রিত হলে মুক্তিযোদ্ধাদের মনোবল যেমন বেড়ে যাবে, তেমনি সরাসরি সমন্বিত আক্রমণ পরিকল্পনার জন্য সকল গ্রুপের কমান্ডারদের সঙ্গে মতবিনিময় ও আলোচনা করে সুষ্ঠু ও কার্যকরী আক্রমণ পরিচালনা করা যাবে। সারারাত এবং পরবর্তী সারাদিন ও রাত্রি যুদ্ধের পর ১৩ই ডিসেম্বর শৈলাবাড়ি ও ১৪ই ডিসেম্বর সিরাজগঞ্জ শহর শত্রুমুক্ত হয়। শৈলাবাড়ি যুদ্ধে তৃতীয় বেঙ্গল থেকে আসা ইঞ্জিনিয়ার আহসান হাবিব, মকবুল হোসেন, সত্যেন বাবু, আবদুল আজিজসহ ৪ জন মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হন। শহরের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে প্রতিরক্ষা-ব্যুহ শক্তিশালী করে বেসামরিক প্রশাসন ব্যবস্থা চালু করা হয়। প্রত্যক্ষ সহযোগিতা করে মুক্তিযোদ্ধারা, যাতে সিভিল প্রশাসন পরিচালনার কোন অসুবিধা না হয়।

রৌমারীর সুদৃঢ় প্রতিরক্ষা-ব্যুহ ভেদ করা তাদের পক্ষে পরে আর সম্ভব হয় নি। মুক্তাঞ্চলটি গোটা রৌমারী থানা এবং দেওয়ানগঞ্জ থানার বৃহদংশ জুড়ে, যার আয়তন ছিল প্রায় চারশো বর্গমাইল। এই বিশাল মুক্তাঞ্চলের প্রতিরক্ষায় তৃতীয় বেঙ্গলের কোম্পানি ছাড়াও তিনটি এফ. এফ. (ফ্রিডম ফাইটার) কোম্পানি নিয়োজিত ছিল। সেপ্টেম্বরের শেষ দিকে প্রতিরক্ষা কার্যক্রমে সুদৃঢ় ও দুর্ভেদ্য করার জন্য প্রথম ও অষ্টম বেঙ্গলের একটি করে কোম্পানিসহ দুই কোম্পানি পাঠানো হয়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এখানে সরকারী প্রশাসন ব্যবস্থা চালু করে। যেখানে অফিস-আদালত প্রশাসন-ব্যবস্থা, পোস্ট-অফিস, কাস্টম-অফিস, খাজনা, ট্যাক্স চালু ছিল। এমন কি, বিচার-ব্যবস্থা চলেছে মুক্তিবাহিনীর পুলিশ আর বিচারক সমন্বয়ে এই মুক্তাঞ্চলে।

মহান মুক্তিযুদ্ধে সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডির অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। আমাদের প্রিয় স্বাধীনতা সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডির কাছেও ঋণী। বিদেশী হয়েও তিনি আমাদেরই মুক্তিযোদ্ধা। ঋণী হয়ে আছে আমাদের

মুক্তিযুদ্ধে বিশেষ অবদান রাখার জন্য। পাকবাহিনীর চূড়ান্ত পরাজয় বরণ করা পর্যন্ত কোনদিনই দখলদার পাকবাহিনী রৌমারী থানা হেড কোয়ার্টারে পাকিস্তানী পতাকা উত্তোলন করতে পারে নি বা সক্ষম হয় নি।

জ্বলে একাত্তরের শিখা :

একাত্তর থেকে ২০১২। কেটে গেছে অনেকগুলি বছর। এরই মধ্যে আমরা পেয়েছি একটি স্বাধীন রাষ্ট্র, পেয়েছি প্রিয় জাতীয় সঙ্গীত আর পতাকা। আবার এরই মধ্যে বিপন্ন হয়েছে স্বাধীনতার মূল্যবোধ। অন্ধকার গুহায় সাময়িক নিদ্রা কাটিয়ে গুটিগুটি করে বেরিয়ে এসেছে পলাতক সরীসৃপ। ভূলুণ্ঠিত হয়েছে অগণিত শহীদের আত্মত্যাগের মহিমা। জাতি সেইসব সূর্য-সৈনিক দেশ প্রেমিকদের সঠিক মূল্যায়ন করতে পেরেছে কি? বিস্মৃতিপ্রবণ বাঙালির আত্মঘাতী চরিত্র দেশকে ঠেলে নিয়ে গেছে সেই পথে। আবার একাত্তরই আমাদের দিয়েছে একটি প্রজন্ম। স্বাধীন বাংলাদেশের মুক্ত মাটিতে হামাগুড়ি দিতে শিখেছে যে-শিশু, সে আজ টগবগে যুবক। এই যুবকদেরকেই দেখি স্বাধীনতা-বিরোধীদের বিচার দাবি করে মিছিলে বজ্রমুষ্ঠি তুলতে। তাই দেখে ভরসা পাই। গর্বে ভরে ওঠে বুক। একের পর এক প্রজন্মের প্রাণে এভাবেই ছড়িয়ে যায় একাত্তরের শিখা। সে-শিখা নিভবে না কোনোদিন। একসাগর রক্তের বিনিময়ে অর্জিত এই দেশটি পৃথিবীর অন্যতম একটি সুখী ও সমৃদ্ধশালী দেশে রূপান্তরিত হোক, এই কামনাই করছি। আর তা হলেই স্বাধীনতার বেদীমূলে আত্মত্যাগী ৩০ লক্ষ শহীদের আত্মা স্বর্গীয়-শান্তি প্রাপ্তিতে সক্ষম হবে।

(তথ্য প্রদানে : মোঃ গোলাম হায়দার খোকা, ডেপুটি ক্যাম্প- ইন-চার্জ, রৌমারী ক্যাম্প, কুড়িগ্রাম)

রৌমারী ক্যাম্প থেকে দলে দলে মুক্তিযোদ্ধারা আসছে। ৮ই ডিসেম্বর আবুল কালামের নেতৃত্বে ১০৪ জনের দলটি হাজালিয়া নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ক্যাম্প স্থাপন করেছে। ১০ই ডিসেম্বর আমির হোসেন ভুলুর নেতৃত্বে ছোনগাছা মাদ্রাসায় এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আবুল কালাম আজাদ, ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের ছাত্র আহসান হাবিব, আবদুস সালাম, এস এম নায়েব আলী, হাসান বিএসসি ইসহাক আলীসহ নেতৃস্থানীয় মুক্তিযোদ্ধাদের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে সিরাজগঞ্জ শহর আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। সিদ্ধান্ত মোতাবেক আমাকে নির্দেশ দেয়া হলো মুক্তিযোদ্ধা ও গোলাবারুদ পাঠানোর জন্য। ইতোমধ্যে পলাশ ডাঙা যুবশিবিরের সাথে মোজাফফর আহমেদের দলটি ভারতে চলে গেছে। একমাত্র আমার দলটিই তখন কাজীপুরে ছিল। সিদ্ধান্ত মোতাবেক আমি আমার গ্রামের বাল্যবন্ধু সোহরাবের

নেতৃত্বে ৩৫ জনের একটি দলকে গোলাবারুদসহ হাছালিয়া ক্যাম্পে পাঠালাম। ১১ই ডিসেম্বর রাতে ওদেরকে পাঠিয়ে দিলাম। ওদিকে, সিরাজগঞ্জের পাকসেনারা শহরের উত্তরে শৈলাতিটা শৈলাবাড়ি ও সিরাজগঞ্জ স্টিমারঘাট পর্যন্ত বিস্তির্ণ এলাকা জুড়ে অবস্থান নিয়েছিল।

১২ই ডিসেম্বর ভোর রাত থেকে শুরু হয়। মুক্তিযোদ্ধারা আমির হোসেন ভুলুর নেতৃত্বে বিভিন্ন গ্রুপে ভাগ হয়ে যায়। অনেকটা কাকতালীয়ভাবেই এই যুদ্ধে ভারতীয় বিমান বাহিনীর তিনটি জঙ্গী বিমান ঐ সময় সিরাজঘাটে আসে এবং বেশ কয়েকটি বোমা বর্ষণ করে। এটা ছিল ভারতীয় বাহিনীর নিয়মিত টহল। কারণ কয়েকদিন আগেই   ডিসেম্বর ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী পাকিস্তানের সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করেন এবং সেই মোতাবেক পূর্ব পাকিস্তানে ভারতীয় সেনাবাহিনী ঢুকে পড়ে মুক্তিবাহিনীর সাথে এক হয়ে যুদ্ধ শুরু করে। তবে সিরাজগঞ্জের মুক্তিযুদ্ধে ভারতীয় বাহিনীর এই বিমান হামলা ছাড়া আর কোন সম্পৃক্ততা ছিল না। কিন্তু ঐ বিমান হামলা মুক্তিযোদ্ধাদের সাংঘাতিকভাবে সহায়তা করে। পাকসেনারা ছত্রভঙ্গ হয়ে পিছু হটে শহরের দিকে চলে যায়। রেখে যায় ১৩/১৪ জন পাকসেনার মৃতদেহ। ১২ই ডিসেম্বর রাতেই শহীদ হয় (১) আমার বাল্যবন্ধু সোহরাব হোসেন। ১৬ই ডিসেম্বর শহীদ হয় তৎকালীন ঢাকা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ৬ষ্ঠ বর্ষের ছাত্র হাছানিয়া গ্রামের (খারুয়া) (২) আহসান হাবিব। এই যুদ্ধে আমাদের মাঝ থেকে হারিয়ে যায় কাজীপুরের আজিতপুর করের (৩) আবদুর রাজ্জাক মল্লিক (৪) কুরালিয়ার মকবুল হোসেন কালু (৫) শিমলার আবদুস সবুর এবং (৬) নাটোরের শ্রী সত্যেন বাবু, রাজশাহীর অরতী। এই যুদ্ধে কোন একক দল বা গ্রুপের কোন সাফল্য ছিল না। আমির হোসেন ভুলুর আহ্বানে সিরাজগঞ্জের বিভিন্নস্থানে অবস্থানরত মুক্তিযোদ্ধার দলগুলির একত্রে অভিযান চালানোর ফসল। ১৪ই ডিসেম্বর ভোর রাতেই পাক-আর্মিরা সিরাজগঞ্জ শহর থেকে ট্রেনযোগে পালিয়ে যায়। রেখে যায় ৯ মাসের ধ্বংসযজ্ঞের চিহ্ন। সমগ্র শহর পুড়ে ছাই করে দিয়েছিল হানাদারেরা। ১৪ই ডিসেম্বর বিকালে ৭-৩০ মি. সিরাজগঞ্জ বি.এ. কলেজ মাঠে নির্মাণাধীন শহীদ মিনারে স্বাধীন বাংলার পতাকা ওড়ান আমির হোসেন ভুলু। স্বাধীন হয় সিরাজগঞ্জ। এবার শুরু হয় পুনর্গঠনের পালা। সকল মুক্তিযোদ্ধার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ৬ সদস্যবিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড কাউন্সিল গঠন করে। এই মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড কাউন্সিলের অস্থায়ী কার্যালয় ছিল বাহিরগোলার বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের রেস্ট হাউজের দ্বিতীয় তলায়। সামরিক-বেসামরিক প্রশাসন নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এবং সিদ্ধান্ত মোতাবেক কার্য-পরিচালনা করা হয়। অধ্যাপক আশরাফ আলী

মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড কাউন্সিলের সমস্ত কাগজপত্র সংরক্ষণ করতেন। ৬ সদস্যবিশিষ্ট কমান্ড কাউন্সিল হলো

১. আমির হোসেন ভুলু (অধিনায়ক), ২. আবদুল লতিফ মির্জা (উপ-অধিনায়ক), ৩. ইসমাঈল হোসেন (সদস্য), ৪. গোলাম হায়দার খোকা (সদস্য), ৫. আমিনুল হোসেন চৌধুরী (সদস্য), ৬. শাহজাহান আলী (সদস্য)। এই কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রত্যেক থানায় একজন করে প্রশাসক (অস্থায়ী) নিয়োগ করা হয়। কাজীপুর থানার দায়িত্বে ছিলাম আমি।



১৯৭২ সালে ৩১শে জানুয়ারি তদানিন্তন বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রী ক্যাপ্টেন এম. মনসুর আলীর কাছে সদলবলে অস্ত্র সমর্পণ করছেন কাজীপুরের মুক্তিবাহিনীর কমান্ডার লুৎফর রহমান দুদু

স্বাধীনতার ২৫ বছর পর সুবর্ণ জয়ন্তী পালন হল '৯৭-তে মহাধূমধাম করে সারাদেশব্যাপী। শিখা-চিরন্তন পরিভ্রমণ করলো সারাদেশে। সিরাজগঞ্জেও এসেছিল শিখা-চিরন্তন। সিরাজগঞ্জের কতজন মুক্তিযোদ্ধা সে অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন, তা জানি না। তবে এটা ভাল করেই জানি যে সিরাজগঞ্জের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস লেখা হয় নি। একাত্তরের সেই দিনগুলি আজ স্মৃতির অন্তরালে বিলীন হতে চলেছে। আস্তে-আস্তে মুক্তিযোদ্ধারা চিরাচরিত নিয়ম অনুযায়ী বিদায় নিচ্ছে পৃথিবী থেকে, এটাই নিয়ম। আর নতুন করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ হবে না, মুক্তিযোদ্ধাও জন্মাবে না। এ. কে. শামসুদ্দিন ফিরে আসবে না, ফিরে আসবে না শহীদ-মুক্তিযোদ্ধারা। কিন্তু এই চির-সত্য চির-উজ্জ্বল মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস যে-সন্তানেরা রচনা করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে অধিক সংখ্যক এখনও বেঁচে আছেন। বঙ্গবন্ধু নেই, মনসুর আলীও নেই, মোতাহার হোসেন নেই, শহীদুল ইসলাম নেই, আমির হোসেন ভুলু নেই। লতিফ মির্জা, সৈয়দ হায়দার আলী, আনোয়ার হোসেন রতু, হেদায়েতুল ইসলাম আজও বেঁচে আছেন। অনায়াসেই রচনা করা যায়, সিরাজগঞ্জের মুক্তিযুদ্ধের সার্বিক ইতিহাস। শুধু প্রয়োজন, রাজনৈতিক সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে পরিষ্কার মনের তীব্র আকাঙ্ক্ষা।

সিরাজগঞ্জের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস যাঁরা সৃষ্টি করেছেন, তাঁদের মধ্যে শহীদ এ. কে. এম. শামসুদ্দিন, শহীদ ইঞ্জিনিয়ার আহসান হাবিব, শহীদ আবদুস সবুর, শহীদ অরুণ কুমার, শহীদ রফিকুল ইসলামসহ বহুসংখ্যক শহীদের বীরত্বের অমর কাহিনী শীর্ষে রেখেই শুরু করতে হবে। ইতিহাসের পাতায় আমির হোসেন ভুলু, আবদুল লতিফ মির্জা, লুৎফর রহমান অরুণ, লুৎফর রহমান দুদু এবং মোজাফফর হোসেন-এর নাম সর্বাগ্রে লিখেই ইতিহাস শুরু করতে হবে। কারণ এঁদের অসীম সাহস ও আত্মত্যাগের কারণেই গড়ে উঠেছিল মুক্তিযোদ্ধাদের দলগুলি। প্রত্যেক দলের প্রত্যেকটি মুক্তিযোদ্ধা সিরাজগঞ্জের শ্রেষ্ঠ সন্তান। যাঁদের কথা এই মুহূর্তে মনে পড়ছে তাঁরা হলেন কাজীপুরের একরামুল হক, আমজাদ হোসেন, আবদুস সাত্তার চাকলাদার, আয়নাল হক, ফজলুল হক, কাজেম উদ্দিন, ইমাম হোসেন, চান্দু, হাবিবুর রহমান, আহম্মদ চাকলাদার, আহাম্মদ মাস্টার, মরহুম রুহুল আমিন, মমতাজ আলী, নূরুল ইসলাম, ইঞ্জিনিয়ার আমজাদ হোসেন, ইঞ্জিনিয়ার আবদুস সাত্তার, আবদুল খালেক মাস্টার, আজাহার আলী, ফজল মেকার, আবদুস সালাম, ইমাম হোসেন, সিরাজগঞ্জের আকবর হোসেন, তোজাম্মেল হোসেন, আমির হোসেন খান, ইসাহাক আলী, জিন্নাহ, ফিরোজ ভূঁইয়া, খ.ম. আকতার, পনির, তৌহিদ, মঞ্জু, আবদুর রউফ পাতা, বিমল কুমার দাস, মরহুম তারা, গোলাম কিবরিয়া, জহুরুল, বেড়ার আবদুস সামাদ, শাহজাদপুরের বাকী মির্জা, বেল্লাল, সলপেব পান্না, আলী আজগর, জহুরুল ইসলাম মিন্টুসহ আরো রায়গঞ্জের নজরুল ইসলাম। এছাড়া নাম না-জানা শহীদ-মুক্তিযোদ্ধা এবং মুক্তিযোদ্ধারা, যাঁদের নাম-ঠিকানা অতি সহজেই সংগ্রহ করে, রচনা করা যেতে পারে সঠিক তথ্য-সম্বলিত মুক্তিযুদ্ধের সত্যিকারের ইতিহাস। যে-ইতিহাস আগামী-প্রজন্মের কাছে স্বাধীনতার দলিল হিসাবে চিরকাল বিবেচিত হতে থাকবে। এই লেখায় যাঁদের নাম আমি স্মরণ করতে পারি নি, তাঁদের কাছে করজোড়ে মিনতি জানিয়ে বর্তমানের সকল রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দকে দলীয় সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে থেকে, মহান মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস প্রণয়নের জন্য অনুরোধ জানিয়ে শেষ করছি। জয় বাংলা। সোনার বাংলা কায়েম হোক। আল্লাহ্ হাফেজ।

সিরাজগঞ্জ জেলার রাজনৈতিক ও সাহিত্যিক ব্যক্তিত্ব


মজলুম জননেতা
মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী


শহিদ ক্যাপ্টেন মনসুর আলী

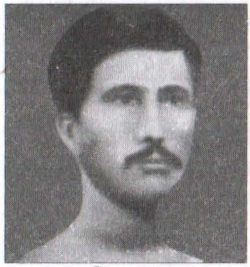

আবদুর রশীদ তর্কবাগিশ


আব্দুল মমিন তালুকদার

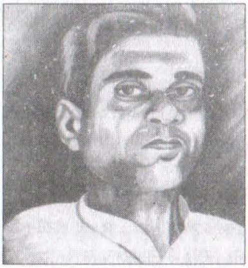

ইসমাইল হোসেন সিরাজী


নজিবুর রহমান সাহিত্যরত্ন


যাদব চক্রবর্তী, গণিতসম্রাট


রজনীকান্ত সেন


মোঃ বরকত উল্লাহ


পণ্ডিত জিএম হিলালী


বন্দে আলী মিয়া


ভাষা সৈনিক আব্দুল মতিন

সিরাজগঞ্জ জেলার সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব

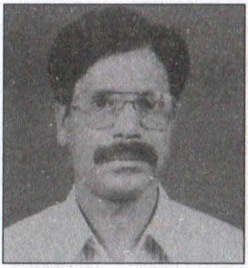

সূচীত্রা সেন


হৈমন্তী শুকলা


বাপ্পী লাহিড়ী

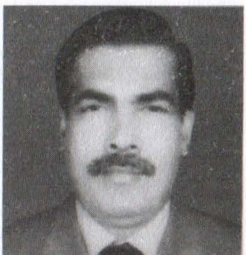
সিরাজগঞ্জ জেলার বীর মুক্তিযোদ্ধারা


মেজর জেনারেল (অব:)
হেলাল মুর্শেদ খান, বীর বিক্রম


আনোয়ার হোসেন পাহাড়ী
বীর প্রতীক

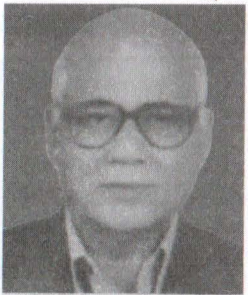

আমীর হোসেন ভুলু


আব্দুল লতিফ মির্জা (এম.পি)

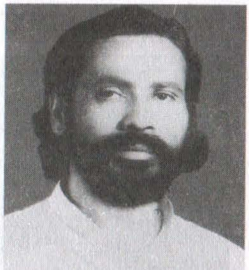

বিমল কুমার দাশ



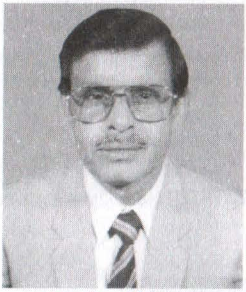
মোতাহার হোসেন তালুকদার



আনোয়ার হোসেন রতু



লুৎফর রহমান অরুণ



লুৎফর রহমান দুদু



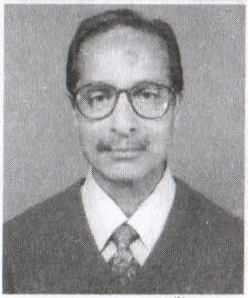
সিরাজুল ইসলাম খাঁন



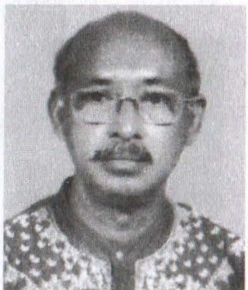
আব্দুল আজিজ সরকার



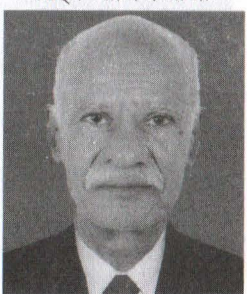
মরহুম আজিজ মীর্জা



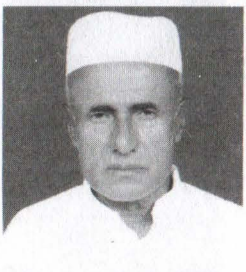
মোঃ মঞ্জুরুল হক ভূঁইয়া



আবদুল হাই তালুকদার



সোহ্‌রাব আলী সরকার



আজিজুল হক বকুল



আব্দুর রউফ পাতা

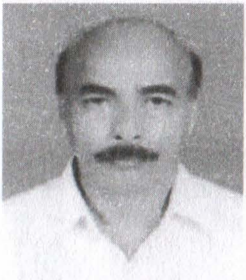
সিরাজগঞ্জ জেলার বীর মুক্তিযোদ্ধারা

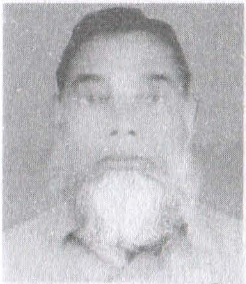

গোলাম কিবরিয়া


গোলাম হায়দার খোকা


আব্দুল বাকী মির্জা


আলহাজ্ব আকবর হোসেন

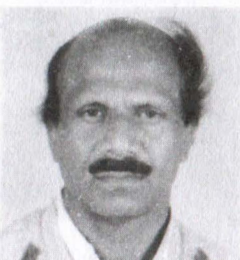

ফিরোজ ভূএঞা


আজহার আলী


মোঃ আব্দুল হান্নান


ফজলুল হক


কে এম হাসান আলী


আবু ইউসুফ সূর্য


আল-হাজ্ব গাজী মোঃ হাবিবুল ইসলাম


আব্দুস সাত্তার আলফা

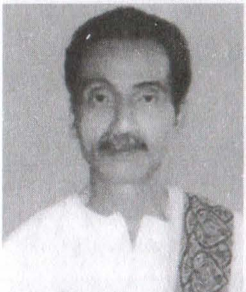
সিরাজগঞ্জ জেলার বীর মুক্তিযোদ্ধারা


আমিনা বেগম মিনা


এস এম হাবিবুর রহমান


আবুল কালাম আজাদ

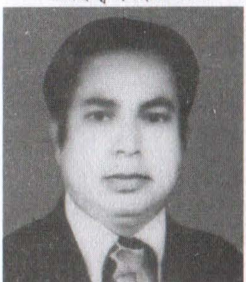

ডাক্তার গোলাপ


মহিউদ্দীন মোঃ আলমগীর


আলহাজ্ব ইসহাক আলী


গাজী লুৎফর রহমান মাখন


আনোয়ার হোসেন সিকদার


শহীদুল ইসলাম তালুকদার

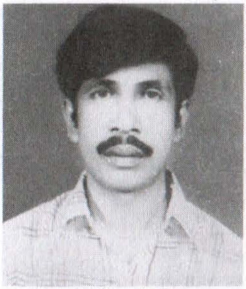

মোঃ রেজাউল করিম


মনিরুল ইসলাম


ইঞ্জিনিয়ার আব্দুস ছাত্তার



মোঃ ছাইদুল হক



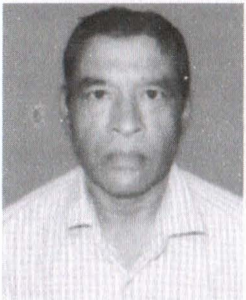
মোঃ কাজিম উদ্দিন



মরহুম একরামুল হক



জি এম তালুকদার



গাজী রেজাউল করিম



মোঃ নজরুল ইসলাম



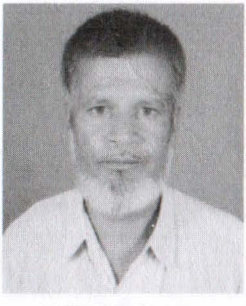
মোঃ ছাইদুল হক



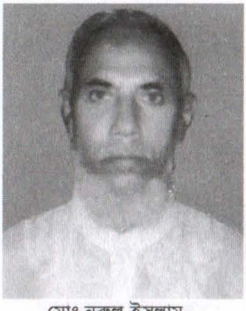
মোঃ আজিজুর রহমান



মোঃ নাসির উদ্দিন



গাজী ছানাহ উল্যাহ

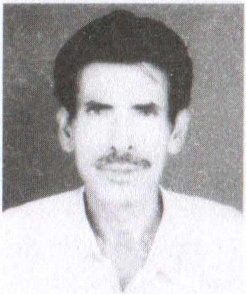


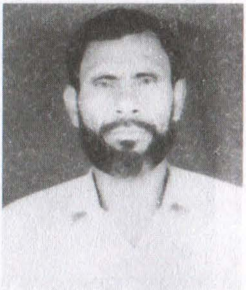
মোঃ নূরুল ইসলাম



মোঃ নূরুল ইসলাম

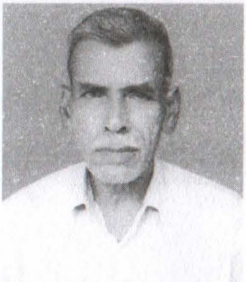
সিরাজগঞ্জ জেলার বীর মুক্তিযোদ্ধারা


মজিবর রহমান

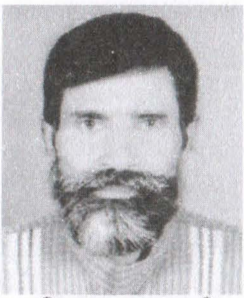

মোঃ জেল হোসেন


মোঃ চাঁদ মিয়া


মোঃ খবির উদ্দিন

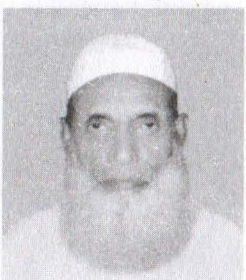

মোঃ মজিবর রহমান

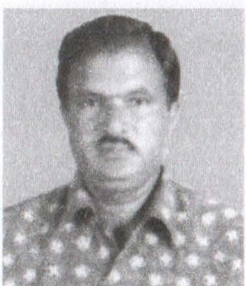

আব্দুস ছালাম


গাজী মোঃ আব্দুল বারী


আমজাদ হোসেন

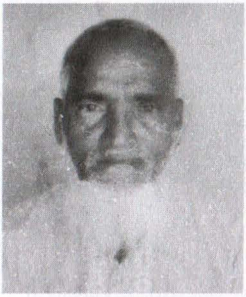

মোঃ সাইদুজ্জামান


গাজী মোস্তাফিজুর রহমান


নজরুল ইসলাম


শাহ আলী সরকার

সিরাজগঞ্জ জেলার বীর মুক্তিযোদ্ধারা



সামসুল হক



গাজী মোঃ শাহ্জাহান আলী



মোহাম্মদ আলী সরকার



গাজী আহমদ আলী



মোঃ আনছারুল ইসলাম



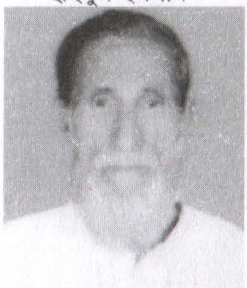
ছাইদুল ইসলাম



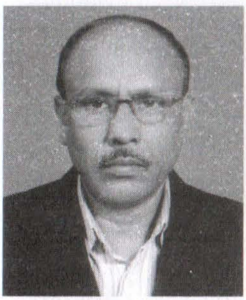
মোঃ আঃ রশিদ



গাজী আব্দুস ছামাদ



গাজী মোঃ আখের আলী



মোঃ সাইফুল ইসলাম

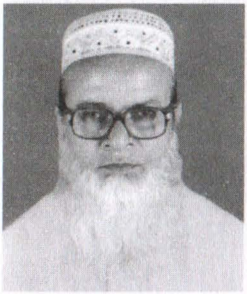


মাহবুবুর রহমান খান



শাহ জামাল

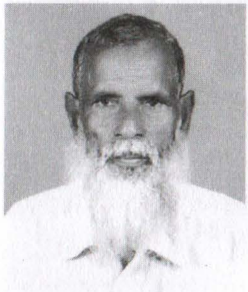
সিরাজগঞ্জ জেলার বীর মুক্তিযোদ্ধারা



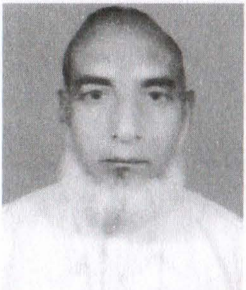
মোঃ আয়নুল হক



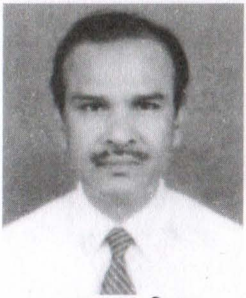
চৌধুরী ইফতেখার মবিন (পান্না)



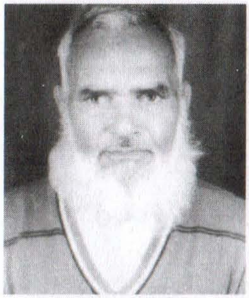
গাজী আমির হোসেন



মোঃ শাহজামাল



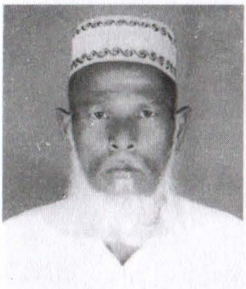
মোঃ বাদশা মিয়া



আবু বক্কার সিদ্দিক



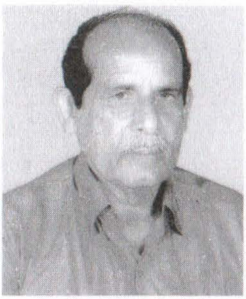
গাজী আঃ ছামাদ



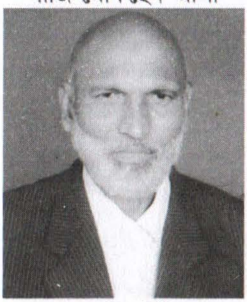
গাজি মোকছেদ আলী



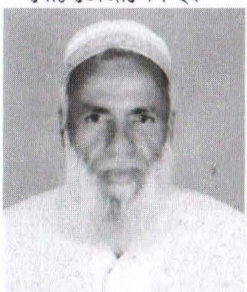
মোঃ তোজাম্মেল হক



গাজী ওসমান গণি



মোঃ রইচ উদ্দিন



মোঃ সাইফুল ইসলাম



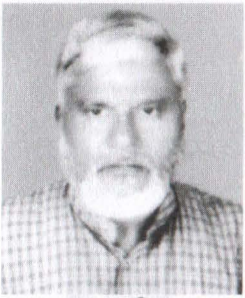
গাজী আঃ ছালাম



মোঃ মোকবুল হোসেন



মোঃ আব্দুস ছাত্তার



আব্দুর রশিদ

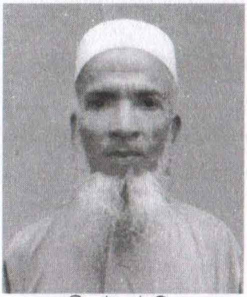


গাজী ইউনুছ উদ্দিন

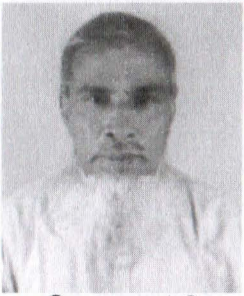




মোঃ আলী আশরাফ চিশতী



গাজী রইচ উদ্দিন



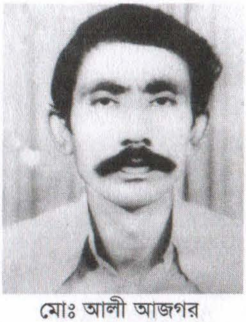
গাজী মোশলেহ উদ্দিন



গাজী ডাঃ এস এম খাজা নাজিম উদ্দিন



মোঃ আলতাফ হোসেন

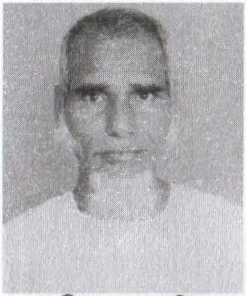


মোঃ আলী আজগর

সিরাজগঞ্জ জেলার বীর মুক্তিযোদ্ধারা



মোঃ আলী সরকার



গাজী আব্দুল হামিদ



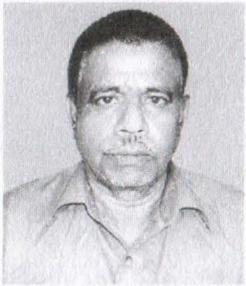
গাজী জয়নুল আবেদীন



গাজী মোঃ আজিজুর রহমান



মোঃ চাঁদ মিয়া



ফজলুল হক



গাজী মোঃ আলতাফ হোসেন



শাজেদুল



মোঃ তোজাম্মেল হোসেন



মোঃ রেফাজ উদ্দিন

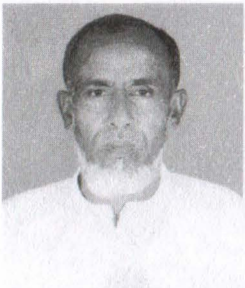


গাজী নজরুল ইসলাম



মোঃ জহুরুল ইসলাম

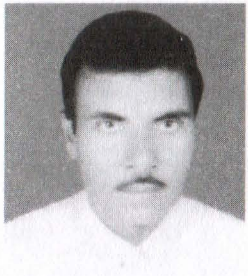
সিরাজগঞ্জ জেলার বীর মুক্তিযোদ্ধারা



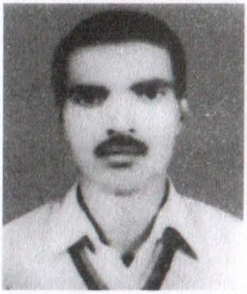
গাজী আবুল হোসেন



আব্দুর রশিদ



গাজী মোঃ আঃ ছালাম



এস.এম রুহুল আমিন



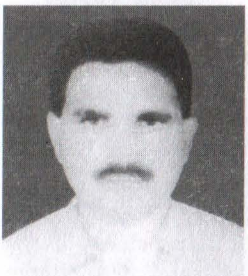
গাজী মোঃ ছিদ্দিক হোসেন



ফজলুল হক



গাজী চাঁন মিয়া



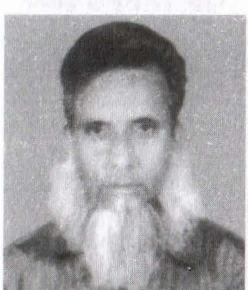
মরহুম আমজাদ হোসেন



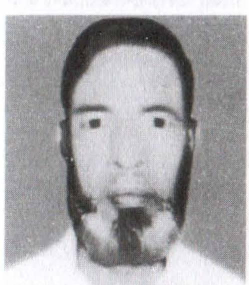
গাজী শাহ আলম



গাজী মোয়াজ্জেম হোসেন

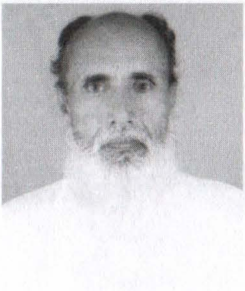


হায়দার আলী



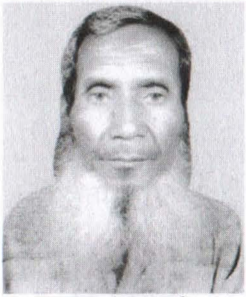
মোঃ শফিকুল আলম

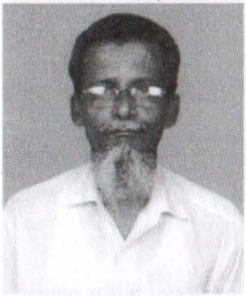
সিরাজগঞ্জ জেলার বীর মুক্তিযোদ্ধারা

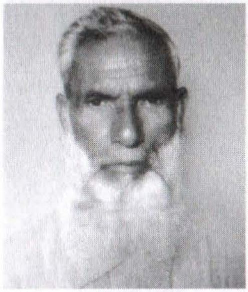

রইচ উদ্দিন

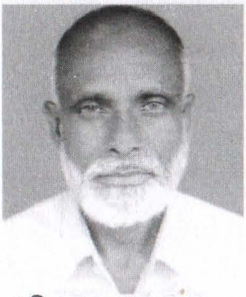

গাজী মোঃ আজিজুল ইসলাম

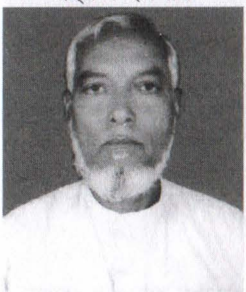

মোঃ মোসলেম উদ্দিন তাং


মোঃ ওসমান গণি

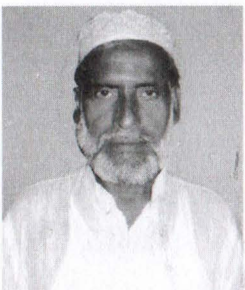

জহুরুল ইসলাম


মোঃ আমিনুল ইসলাম


গাজী মোঃ মোজাম্মেল হক


গাজী মোমতাজ উদ্দিন

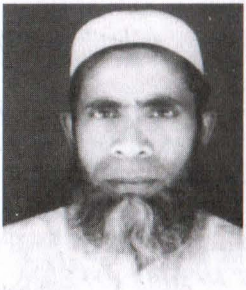

গাজী মোঃ আবদুর রহমান

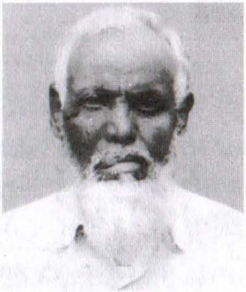

মোঃ আলী আশরাফ


আব্দুস সাত্তার চাকলাদার

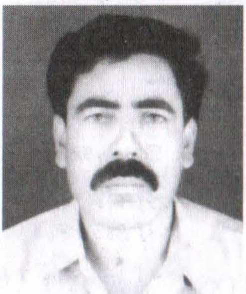

মোঃ কেরামত আলী


মোঃ মফিজ উদ্দিন

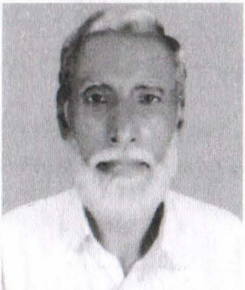

শাহা আলী


মোঃ ইউনুছ আলী


গাজী আঃ বারী

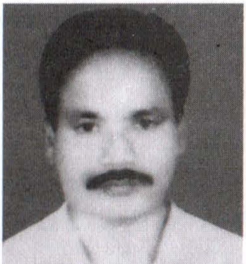

গাজী আবুল কাশেম

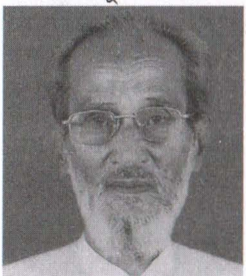

মোঃ রেজাউল করিম খোকন

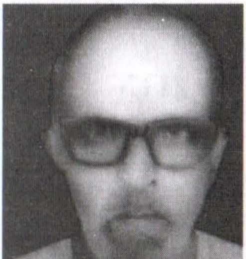

গাজী জিয়াউল হক


মোঃ আব্দুস সাত্তার


মোঃ সোহরাব আলী তালুকদার


আনিছুর রহমান


আমির হোসেন সরকার


আবুল হোসেন তালুকদার

মুক্তিযুদ্ধকালীন ছোনগাছা মাদ্রাসার মিটিংয়ের রেজুলেশনের কপি

Monday   March 1964

Honest work alone gives the thrill of real accomplishment

Month of August Expenditure — 227/00

Month of September Expenditure — 719/00

October Expenditure — 638/00

1584/00.

ছোনগাছা মাদ্রাসার মিটিং — ১০।১২।৭১

মুক্তি বাহিনী	F.F.	[illegible] বাহিনী
১। ইসহাক	১। ইসমাইল	১। ইসমাইল
২। আমিনুল	২। মোক্তার	২। আব্দুল মজিদ
৩। আসাদউদ্দীন	৪। ইউসুফ	৩। সোবহান
৪। ইব্রাহিম	৫। মোজাহার	৪। নুরুল [illegible]
৫। মনসুর	৬। নাজমুল	
৬। জাকারিয়া	৭। ইউসুফ	
৭। মহসিন	৮। [illegible]	
	৯। [illegible]	
	১০। কামাল	
	১১। আনোয়ার হোসেন	

অদ্য মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে মিটিং [illegible] রাত ৮ ঘটিকায়।

১২।১২।৭১ দুপুর ২ ঘটিকায় [illegible] মোজাহার [illegible] শহীদ হন

১৩।১২।৭১ [illegible]

A wise man always knows when to stop for breathing space

[illegible]

[illegible]

[illegible] (পাকিস্তান) [illegible]

১২।১২। [illegible]

[illegible]

If you wish to do a good deed, consult no one

নোটিশ—

এতদ্বারা নিম্নোক্ত মেম্বারগণকে জানান যাইতেছে যে আগামী মার্চ ১০ তারিখে মঙ্গলবার বিকাল ৩টার সময় উপস্থিত হইবেন এবং কমিটি মিটিং এর কাজ সমাধান করার জন্য আহ্বান করা যাইতেছে।

তাং [illegible]।১২।৭২

আহ্বায়ক
আমির হোসেন

১। ইসমাইল হোসেন
২। আমিনুল ইসলাম
৩। ইসহাক ভূঁইয়া
৪। আলম ভূঁইয়া
৫। ইসমাইল হোসেন
৬। ~~[illegible]~~ মোশারফ ~~[illegible]~~ হাওলাদার
৭। আ মতলেব ইসলাম
৮। ইদ্রিস
৯। মজিবর
১০। আব্দুল মালেক
১১। ভোলা
১২। চানমিয়া
১৩। নাসির আলী
১৪। লিয়াকত

K. M. Sarkar

দেশ ও জনগণের অতন্দ্র প্রহরী ।

বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ

জেলা ইউনিট কমান্ড, সিরাজগঞ্জ ।

মুক্তিযোদ্ধা সংসদ ভবন, সোহরাওয়ার্দী সড়ক, সিরাজগঞ্জ ।

সূত্র : তারিখ :

৩০ লক্ষ শহীদের আত্মদান, কয়েক কোটি মানুষের অপরিসীম ত্যাগ এবং বাংলা মায়ের মৃত্যুঞ্জয়ী সন্তানদের অতুলনীয় সাহসিকতাপূর্ণ যুদ্ধের দ্বারা অর্জিত হয়েছে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ । ১৯৭১ সনে এর ২ শে মার্চ জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংরাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করে ছিলেন এবং বাঙালি জাতিকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে এই স্বাধীনতায় অংশগ্রহনের জন্য আহ্বান করে ছিলেন । সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে ৭১/২৬ শে মার্চ হতে আমরা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করি এবং উত্তর বঙ্গে আমরা এক বিরাট বাহিনী গড়ে তুলি যার পরিচালক ছিলেন সাবেক ছাত্র নেতা সাবেক এম.পি মরহুম আব্দুল লতিফ মির্জ্জা আমাদের বাহিনীর নাম ছিলো পলাশডাঙ্গা যুব শিবির আমি নিজে ঐ দলের অধিনায়ক ছিলাম । সহকারী অধিনায়ক বিমল কুমার দাস ও বর্তমান তাড়াশ থানার উপজেলা চেয়ারম্যান গাজী আমজাদ হোসেন ও ব্যাটেলিয়ান কমান্ডার লুৎফর রহমান অরুন । আমরা সাহসীকতার সহিত পাক আর্মির সাথে ১১ নভেম্বর ১৯৭১ তাড়াশ থানা অধীন নওগাতে অনেক পাক আর্মিকে হত্যা করি ও ক্যা. সেলিমসহ ১২ জন আর্মি জীবিত অবস্থায় ধরি ।

আমাদের এই বিরত্বগাঁথা যুদ্ধের ইতিহাসকে নুতন প্রজন্মের নিকট তুলে ধরার জন্য আমি পলাশ ডাঙ্গা যুব শিবিরের পক্ষ থেকে বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা গাজী লুৎফর রহমানকে জানাই অনেক অনেক ধন্যবাদ ও শুভে"ছা এবং দীর্ঘায়ু কামনা করি যেন সে আরও ভাল কিছু নুতন প্রজন্মকে উপহার দিতে পারেন ।

গাজী সোহরাব আলি সরকার
প্রা: অধিনায়াক পলাশ ডাঙ্গা যুব শিবির, সিরাজগঞ্জ ।

সিরাজগঞ্জে মুক্তিযুদ্ধ ও লুৎফর রহমান

হাজার বছরের ঐতিহ্যের দেশ বাংলাদেশ । যে দেশের রক্তাক্ত ইতিহাস রয়েছে । সে দেশ আমাদের প্রাণের বাংলাদেশ । বাংরাদেশের মুক্তিযুদ্ধের যে সংগ্রামী ইতিহাস রয়েছে তা বিশ্বের ইতিহাসে বিরল । যে যুদ্ধ বিশ্ব মানচিত্রে বাংলাদেশকে একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট হিসেবে অঙ্কন করেছে । যুদ্ধ সৈনিক বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা লুৎফর রহমান (দুদু)-এর কাছ থেকে আমরা সিরাজগঞ্জের প্রকৃত ইতিহাস জানতে পারব । যুদ্ধোত্তর বাংরাদেশে বিকৃত ইতিহাস চেতনার মধ্যে অতি অল্প মানুষের মধ্যেই সঠিক ইতিহাস চেতনাকে খুঁজে পাওয়া যায় । তার মধ্যে লুৎফর রহমান ৪ (চার) দশক পরে হলেও তিনি মুক্তিযুদ্ধের সোনালী জীবন সায়াহ্নে সঠিক ইতিহাস তুলে ধরে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে দায়িত্ব স্বীকার করেছেন । বইটতে মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাসকে আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের কাছে তুলে ধরেছেন ।

যে আদর্শ, লক্ষ্য চেতনা নিয়ে বাংলাদেশের মুক্তিকামী লাখো লাখো মানুষ সমাজ ও জাতীয় জবিনে মুক্তিযুদ্ধের সেই আদর্শ ও চেতনাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে । জাতি বেশি বেশি করে এ ধরণের ইতিহাস সচেতন লেখা আশা করছে ।

(অধ্যক্ষ আব্দুল আজিজ সরকার)
অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, পলাশডাঙ্গা যুব শিবির, কামারখন্দ, সিরাজগঞ্জ

ইতিহাস জাগ্রত

আজকে ভাবতে আমার অবাক লাগছে স্বাধীনতার ৪২ বছর পরে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে কলঙ্কিত করার বা ভিন্ন পথে পরিচালিত করার যে হীন প্রয়াশ চলছিল ঠিক সেই সময় জানতে পারলাম, আমাদেরই এক সাথী জনাব লুৎফর রহমান দুদু যে ১৯৬৬ সন থেকে বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতীয়তাবাদী আন্দোলন, স্বাধীকার আন্দোলনকে ধীরে ধীরে স্বাধীনতা সংগ্রামের দিকে নিয়ে যায়। এবং দীর্ঘ সময় আন্দোলন ও সংগ্রামের সাথী জনাব লুৎফর রহমান মুক্তিযুদ্ধের উপর একখানি বই লেখার উদ্যোগ নিয়েছে। আমি আবেগাপ্লুত হয়ে এই কাজটি করার জন্য তাহাকে বার বার উৎসাহিত করি। একবার ১৫ই আগষ্ট আমি সিরাজগঞ্জে কয়েকজন কর্মী নিয়ে চলছি হঠাৎ শতিয়া বাবু আমাকে ডেকে বলে "ভাই আস বস চা খাও, তোমার মনে নেই পলাশী আমরোকননে বাংলার স্বাধীনতার সূর্য অস্তমিত হওয়ার পরে মুর্শিদাবাদের মানুষ বিজয় মিছিল করেছে এবং মিষ্টি বিতরণ করেছে। তাহার ৫০ বছর পর সমস্ত বাঙালি নবাব সিরাজের পালা গান শুনে কেঁদে যার যার। বাংলার ইতিহাসকে কেউ কলঙ্কিত করতে পারবে না ইতিহাস সদা জাগ্রত। সিরাজগঞ্জের মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন ঘটনা নিয়ে জনাব লুৎফর রহমানের এই প্রয়াসকে আমি মোবারকবাদ ও সাধুবাদ জানাই, উনার এই মহতী কাজটি করার জন্য।

জনাব আজিজুল হক বকুল

সদস্য সচিব, স্বাধীন বাঙলা সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ, সিরাজগঞ্জ। ১৯৭১ সন।

যে জাতি বীরদের সম্মান করে না, সে জাতির উন্নতি অনিশ্চিত

দেরীতে হলেও সিরাজগঞ্জ এর মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস প্রকাশিত হ"ছ। শুনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত ও গর্বিত। একজন অপরাজিত মুক্তিযোদ্ধা ব্যাটালিয়ন কমান্ডার ও প্রধান অস্ত্র প্রশিক্ষক এর দায়িত্বে আমি সম্পূর্ণ বীরত্বের সাথে পালন করতে পেরেছি এবং আমার সহযোদ্ধারা আমার প্রশিক্ষণে ও আমার নির্দেশে এক বাক্যে পালন করে আমার নেতৃত্বের মান মর্যাদা রেখে প্রত্যেক যুদ্ধে জয়ী হয়েছে। তার স্বীকৃতি ৪১ বৎসর পর হলেও পেলাম। এই জন্য আমার মিতা যুদ্ধকালীন কাজিপুর থানার দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা লুৎফর রহমান দুদু মৃত্যু শয্যায় থেকে এই ইতিহাস অনেক পরিশ্রম এবং কষ্টসাধ্য করে লিখেছেন। এই জন্য আমার প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা ও পলাশডাঙ্গা যুব শিবিরের পক্ষ থেকে তার দীর্ঘায়ু কামনা করি। তিনি সিরাজগঞ্জের মুক্তিযুদ্ধের প্রথম ইতিহাস প্রকাশ করেছেন। তাই এর মধ্যে অনেক ভুলত্রুটি থাকা স্বাভাবিক। আমি আগামী প্রজন্ম ও পাঠককে অনুরোধ করছি তার ভুলত্রুটি ক্ষমা সুন্দর চোখে দেখে ৭১-এ ফিরে গিয়ে মুক্তিযুদ্ধের বাস্তব চিত্র ও চেতনাকে হৃদয়ে ধারণ করুন। লেখক আমার ভারতে যাওয়ার সাথী। এক সাথে বহু কষ্ট করে খেয়ে না খেয়ে ভারতে পৌছি। সেও আমার প্রশিক্ষণার্থী। তাই তার দীর্ঘ জীবন বেশি বেশি করে কামনা করি। আগামীতে মুক্তিযুদ্ধের প্রজন্ম প্রতিবাদী হবে এই কামনা করি। আল্লাহ হাফেজ– জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু, জয় হোক মুক্তিযুদ্ধের চেতনার।

নিবেদক

(গাজী লুৎফর রহমান অরুন)
প্রধান অস্ত্র প্রশিক্ষক
সিরাজগঞ্জ বি.এ. কলেজ মাঠ, ৭১, ব্যাটালিয়ন কমান্ডার
পলাশডাঙ্গা যুব শিবির, ৭১, প্রধান অপারেশন পরিচালক
৭১, জেলা কমান্ডার (১৮৮১-১৯৯২)।

তথ্য প্রদান : ১. আব্দুল আজিজ সরকার (পলাশ ডাঙ্গা যুব শিবির), ২. সোরহাব আলী সরকার (বর্তমান মুক্তিযোদ্ধা জেলা কমাণ্ডার), ৩. লুৎফর রহমান অরুন, ৪. গোলাম হায়দার খোকা (রৌমারী)।

পলাশ ডাঙ্গা যুদ্ধশিবীরের তথ্য প্রদানকারী আওয়ামী লীগের তথ্য প্রদান করেন : ১. আনোয়ার হোসেন রতু, ২. আবু হেনা এম.পি.।

সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য সংগ্রাম পরিষদ : ১. সিরাজুল ইসলাম খান, ২. আব্দুর রউফ পাতা।

স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ : ১. আজিজুল হক বকুল (সদস্য সচিব), ২. মহিউদ্দিন মোহাম্মদ আলমগীর (আহ্বায়ক)।